প্রধান।	কাগজে বেরুবে। কাগজে বেরুবে। তা কী হবে তাতে করে।
২য় ফটোগ্রাফার।	কী আবার হবে, লোকে দেখবে, জানবে দেশের অবস্থা!
প্রধান।	দেশের অবস্থা! তা পাবে কোথায় তারা কাগজ!
২য় ফটোগ্রাফার।	কেন কিনে পড়বে।
প্রধান।	কিনে পড়বে?
২য় ফটোগ্রাফার	হ্যাঁ।
প্রধান।	আপনারা বিক্রি করবেন!
২য় ফটোগ্রাফার।	বিক্রি—হ্যাঁ তা বিক্রি না করলে পাবে কোত্থেকে লোকে কাগজ!
প্রধান।	ও, তাও তো বটে। তা ভালো, কঙ্কালের ছবির কারবার। কঙ্কালের ছবির ব্যবসা। তা ভালো, কিন্তু আমারে কী করতে হবে এখন?
১ম ফটোগ্রাফার।	তোমাকে, এই একটুখানি উঠে দাঁড়াবে আর কী। একটুখানি উঠে—
প্রধান।	এমনি উঠে দাঁড়াব!
২য় ফটোগ্রাফার।	হ্যাঁ, অমনি একটু দাঁড়াবে আর কী। পয়সা দেবখ'ন তোমায়। পয়সা দেবখ'ন।
প্রধান।	পয়সা দেবে। তা দিয়ো। আমারে তোমরা পয়সা দিয়ো। তা এই মাটির হাঁড়িটা হাতে করে দাঁড়াব বাবু। হাতে করে দাঁড়াব মাটির হাঁড়িটা! বেশ দেখতে হবেখ'ন। বেশ ভালো দেখতে হবে'খন।
২য় ফটোগ্রাফার।	হাতে নেবে—হাঁড়িটা—(প্রথম ফটোগ্রাফারের ইঙ্গিতে) তা নাও, নাও।
প্রধান।	(উঠতে উঠতে) হ্যাঁ তাই নেই, তাই নেই। হাতে করে দাঁড়াই হাঁড়িটা। হাতে করে দাঁড়াই—তো ন্যাও, তোলো এইবার, ছবি তোলো। কঙ্কালের ছবি তোলো—
২য় ফটোগ্রাফার।	রয়! রয়! গেট রেডি।
প্রধান।	তোলো, কঙ্কালের ছবি তোলো।
১ম ফটোগ্রাফার।	(ছবি তুলে হাসতে হাসতে) ব্যস, এ তো কতক্ষণ আর!
প্রধান।	হয়ে গেছে!
১ম ফটোগ্রাফার।	হ্যাঁ দাদা, হয়ে গেছে। এক সেকেন্ডের তো ব্যাপার। এই নাও, তোমায় পয়সা দেব বলেছিলাম, এই নাও।
প্রধান।	হ্যাঁ, পয়সা দেবে বলেছিলে, পয়সা দাও।
১ম ফটোগ্রাফার।	(পয়সা দিয়ে) কেমন, খুশি তো! আচ্ছা!—দি গ্রেট প্যাটরিয়ার্ক।
	[পয়সা দিয়ে ফটোগ্রাফারের প্রস্থান।]
প্রধান।	যাও বেচোগে, কঙ্কালের ছবি বেচোগে। যাও যাও।

(আবার সেলাই করতে বসে।
নেপথ্যে ঢ্যাঁড়া পেটার শব্দ—কী একটা যেন ঘোষণা করে দেওয়া হচ্ছে।
একটু পরেই ঢোল শহরৎ করতে করতে জনৈক ডোমের প্রবেশ।)

ডোম।	(ঢোলে তিনটি ঘা মেরে) আরে বাজারখোলামে খিচড়ি দেওয়া হোবে। ভিখারি লোগোঁ সব বাজারখোলা চলা যাও।

[ডুম, ডুম, ডুম—ঢোলে আবার তিনটি ঘা মারে।]

জনৈক ভিখারি। (কৌতুহলী হয়ে) কোথায় বাবা, কোথায় খিচুড়ি দেবে!

ডোম। বাজারখোলা বাজারখোলা। (ঢোলে তিন ঘা মেরে) বাজারখোলামে খিচুড়ি দেওয়া হোবে ভিখারি লোগোঁ সব বাজারখোলা চলা যাও। (তিন ঘা)

[ঘোষণা শুনে ভিখারিদের মধ্যে একটা সাড়া পড়ে যায়। নিজের নিজের তল্পিতল্পা গুটিয়ে সকলেই বাজারখোলার উদ্দেশ্য রওনা হয় তাড়তাড়ি।]

রাধিকা। (চিৎকার করে ডাকে) ও বিনো, বিনো রে। (কুঞ্জকে) ওগো বিনো কোথায় গেল গো! য়্যাঁ, ও বিনো—দ্যাখো গে সে হয়ত আগে ভাগে গিয়েই বসে আছে, যত সব— ওমা, তা বলে তো যাবে, কী কাণ্ড—

[দু-একজন ভিখিরি ও প্রধান ছাড়া কুঞ্জ রাধিকা প্রভৃতির দ্রুত প্রস্থান। প্রধান কাঁধের ওপর ছেঁড়া কাঁথা, জামা আর বিশ্বের আবর্জনা চাপিয়ে মুখ নিয়ে ডোমের কথার অনুকরণ করতে থাকে।]

প্রধান। বাজারখোলা খিচুড়ি দেওয়া হবে, সব বাজারখোলা চলে যাও। ডুম্, ডুম্, ডুম্। সব বাজারখোলা চলে যাও। ডুম্, ডুম্, ডুম্, ডুম্।

[অন্য ভিখারিদের পিছুপিছু প্রধানের প্রস্থান। জনৈক টাউটের প্রবেশ। লিকলিকে চেহারা। জুলজুলে দৃষ্টি। ঢুকেই পার্কের বেঞ্চের এককোণে বসে বিড়ি টানতে টানতে চারিদিকে নিরীক্ষণ করতে লাগল। এমন সময় হন্তদন্ত হয়ে বিনোদিনী প্রবেশ করল।]

বিনো। ওমা, এরা সব গেল কোথায় গো!

[টাউট মুচকি মুচকি হাসে।]

কী ক্করি এখন। ওগা বাবু, বলতে পারো এরা সব গেল কোথায়? আমি বাবু একটু ভিক্ষেয় বেরিয়েছিলাম। এসে দেখি—এখন কোন দিকে যাই আমি—

টাউট। বলা-তো মুশকিল এখন কোন্ দিকে গেছে ওরা! তা—

বিনো। হায় হায় হায় হায়, কী করি এখন আমি!

টাউট। সঙ্গে কে ছিল তোমার!

বিনো। কী বললেন বাবু?

টাউট। না বলছি বলি সঙ্গে আপনার জন তোমার কারা ছিল?

[বিনোদিনী নিরুত্তর।]

স্বামী আছে তোমার?

বিনো। ছিল, ফেলে চলে গেছে।

টাউট। ফেলে চলে গেল। এই সোনার পারা মুখ তোমার বাছা, ফেলে চলে গেল এমন একলাটি। ভারি অন্যায় কথা। এখন এই শহর-বাজার, মন্দলোকের অভাব নেই—মুশকিলের কথা।

বিনো। (করুণভাবে) কী করি এখন বাবু আমি?

টাউট। মেয়েমানুষ তুমি বাছা, কিই বা করতে বলব তোমায়—

বিনো। আপনি বাবু এট্টু সন্ধান করি দিন, বাপ আমার।

টাউট। সন্ধান আমি এখন কোথায় করি বলো তো চট করে। কত লোকই তো এসেছে শহরে! আর তাদের মুখ চিনলেও বা কথা ছিল। সন্ধান করলেই কি আর সন্ধান মিলবে! সে অসম্ভব— আচ্ছা দ্যাখো বাছা, আমি তোমার জন্যে যেটুকু করতে পারি বলি। দ্যাখো, এখানে আমার জানা-শোনা এক ভদ্দরলোকের বাড়ি আছে। বলে কয়ে আমি হয়তো সেখানে তোমার খাবার থাকবার একটা বন্দোবস্ত করে দিতে পারি। এই আর কি টুকিটাকি কাজকর্ম করলে সংসারের, আর দুটি দুটি খেলে, বাড়ির বাবু খুব লোক ভালো, একেবারে শিবতুল্য—এখন কথা কী, যে আপাতত সেখানেই না হয় ক'দিন থাকলে, তারপর এদিকে আমিও খোঁজ পত্তর করে দেখলাম......কী বল?

বিনো। আপনি আমার মা-বাপ বাবু।

[টাউট উঠে দাঁড়ায়।]

টাউট। খাবার থাকবার সেখানে তোমার কোনো অসুবিধে হবার কথা নয়, তবে বড়লোক মানুষ, অগাধ টাকা পয়সা, মাঝে মাঝে একুট আদটু আবদার-টাবদার হয়তো করবে, এই। তা ছাড়া একেবারেই মাটির মানুষ, মন জুগিয়ে চলতে পারলে দেখবে সে তোমার একেবারে........তো নাও, এসো এসো। তোমার ভাগ্যি ভালো বুঝলে, যে, হে হে কী আর বলি, এসো এসো।

[উভয়ের প্রস্থান।]

(পটক্ষেপ)

তৃতীয় দৃশ্য

শহরের রাজপথ। পাশেই এক ধনীর আবাসভবন। সামনের ফটক দিয়ে যাচ্ছে সুবেশ পুরুষ ও মহিলারা ঢুকছেন বেরুচ্ছেন। ফটকের ভেতরে ঢুকতে ডাইনে বাঁয়ে সারবন্দী ভেনেস্তা কাঠের চেয়ারগুলোর গা বেয়ে যেন বজলি বাতির আলো চঁইয়ে পড়ছে। অন্দরমহল থেকে সানাই এর সুর কেঁদে কেঁদে উঠছে—আশাবরীর আলাপ চলেছে বিলম্বিত তানে। হাসির লহরী তুলে কলহাস্যমুখর একদল তরুণী যেন এক ঝাঁক প্রজাপতির মতোই উড়ে বেরিয়ে গেল ফটকের ভেতর দিয়ে। ফটকের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন সপারিষদ বাড়ির বড়োকর্তা। অভ্যাগতদের আপ্যায়ন করেছেন এই যে আসুন—বসুন।' তাঁর পাশেই দাঁড়িয়ে আছে দশ বারো বৎসরের একটি ফুটফুটে মেয়ে, হাতে তার এককাড়ি বেলকুঁড়ির মালা। এই

গেল মঞ্চের ডানদিকের ব্যাপার। আর মঞ্চের বাঁ দিকের এক কোণে অর্ধবৃত্তাকারে দেখা যাচ্ছে একটা ডাস্টবিন—অস্পষ্ট। কুঞ্জ ও রাধিকা ডাস্টবিনের উচ্ছিষ্ট কলাপাতার স্তুপ ঘেঁটে আহার্য সন্ধান করছে। কিন্তু আলোর অস্পষ্টতার দরুণ ওদের কাউকেই ভালো করে ঠাহর করা যাচ্ছে না। ডাস্টবিনের আশপাশ থেকে মাঝে মাঝে ক্ষুব্ধ কুকুরের গোঙানি স্পষ্টভাবে শোনা যাচ্ছে। প্রধানকে খানিকটা স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে। ফটক থেকে খানিকটা দুরে দাঁড়িয়ে বড়োবাড়ির দিকে হাত তুলে কাতর আবেদন জানাচ্ছে সে দুটি ভাতের জন্য। একটু পরে রাধিকাকেও স্পষ্টভাবে দেখা যায়। মুখে তারও দুটি অন্নের কাতর প্রার্থনা। হঠাৎ ডাস্টবিনের কাছটার একটা কুকুর গর্জে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে কুঞ্জও চেঁচিয়ে ওঠে পাশব আক্রোশে। মুহূর্তকাল পরেই দেখা যায় কুঞ্জকে—ক্ষত বিক্ষত হাতটা তুলে ধরে আলোর দিকে এগিয়ে আসছে। দংশন ক্ষত হাত থেকে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত ঝরে পড়ছে মাটিতে। (খণ্ডদৃশ্য দুটি দেখাবার জন্য স্পটলাইটের সাহায্য নেওয়া একান্তই বাঞ্ছনীয়)।

বড়োকর্তা। (জনৈক ভদ্রবেশী আগন্তুককে একটা ফুলের মালা দিয়ে সংবর্ধনা করে) এই যে আসুন, আসুন (মুখে হাসি) হেঃ হেঃ আসুন।

[প্রতিনমস্কার জানিয়ে ১নম্বর ভদ্রলোক বাড়ির ভেতর ঢুকে গেলেন সরাসরি। গল্প করতে দুই ও তিন নম্বর ভদ্রলোকের প্রবেশ।]

২য় ভদ্রলোক। আসল কথা কী জান ভাই, টাকা, টাকা। টাকায় সব করে। আমাদের বাঙালি বিজনেসম্যানদের টাকা কোথায়! যাও বম্বে, আমেদাবাদ, দেখবে—

[বড়োকর্তাকে দেখে একগাল হেসে]

আরে, লেট করে ফেল্‌লাম নাকি?

বড়োকর্তা। (হেসে) আরে এসো এসো, ভায়া এসো, ভায়া এসো। তারপর মুখুজ্জ্যে কোথায়? নির্মলবাবু এলেন না?

২য় ভদ্রলোক। (হাত তুলে) আসছে, আসছে সবাই আসছে। (পেছনে তাকিয়ে বিস্মিতের ভঙ্গিতে) আরে, কৈ হে, আবার পেছনে পড়লে ক্যানো! বলি, হ্যাঁ হে মুখুজ্জে।

২য় ভদ্রলোক। তারপর, বড়োবাবু যে একেবারে দেখি—উঃ—হেঃ হেঃ হেঃ হেঃ।

[নেপথ্যে 'মাগো মাগো' ধ্বনি। নির্মলবাবুর প্রবেশ।]

নির্মলবাবু। (এগিয়ে এসে) এই যে দাদা।

২য় ভদ্রলোক। আরে এসো এসো। নির্মলবাবু এসো।

৩য় ভদ্রলোক। ব্ল্যাক আউটের বাজারে চলাফেরা করাই দায়, আর.........

বড়োকর্তা। আর বোলো না ভায়া। একে ব্ল্যাক আউট, তারপর আবার এই ওয়েদার। আমারই দুরদৃষ্ট আর কী! এখন ভালোয় ভালোয় কাজটা—

২য় ভদ্রলোক। হ্যাঁ, তারপর কতজনকে নেমন্তন্ন করলে?

বড়োকর্তা। তা-ভাই হাজার খানেক হবে। ছেঁটে কেটে ওর চেয়ে আর কমতি করা গেল না।

৩য় ভদ্রলোক। পুরোপুরি এক হাজার? বল কী হে, পঞ্চাশ জনের জায়গায় এক হাজার! ভারতরক্ষাবিধানে লটকে যাবে যে বাবা।

বড়োকর্তা। হ্যাঁ ও বিধান আছে, আইন আছে, আবার আইনের ফাঁকও আছে (হাসি) আর কী করেই বা কম করি বল? এই তো ফ্রেন্ডস্ এণ্ড রিলেশন্ যা এখানে রয়ে গেছে, তাঁদের সংখ্যাই তো তোমার শ' পাঁচেকের কম নয়। তারপর—

[নেপথ্যে 'মাগো মাগো' ধ্বনি।]

২য় ভদ্রলোক। তা তো বটেই। তা আর হবে না। এ আর একটা বেশি কথা কী হল। এই তো তোমার গিয়ে গত এপ্রেলে, আমার নাতির অন্নপ্রাশনের সময়, বিয়ে-সাদির মতন সে তো আর তেমন একটা বিরাট কায্যি নয়, তবু ছেঁটে কেটে শ আষ্টেকের কম কিছুতেই করতে পারলাম না। আর এ তো তোমার গিয়ে রীতিমত একটা বিয়ের ব্যাপার।

নির্মলবাবু। তা হলে তো রাজসিক ব্যাপার করে ফেলেছ হে দেখছি রায় মশাই, য়্যাঁ! হাজার খানেক লোক খাচ্ছে, এই বাজারে, চাড্ডিখানি কথা নয়।

১য় ভদ্রলোক। তবে!

নির্মলবাবু। তা জিনিসপত্তর ঠিক মতো জোগাড় করতে পাল্লে তো? কোনো অসুবিধে হয়নি।

বড়োকর্তা। অসুবিধে মানে, চোরাবাজার। চোরাবাজার। চোরাবাজার যদ্দিন আছে ততদিন—

২য় ভদ্রলোক। তার আর কী করবে কী করবে ভাই। সত্যি কথা বলতে গেলে এই চোরাবাজারটি ছিল বলে তাই এখনও কিছুতে আটকাচ্ছে না, নইলে—করবে কী লোকে বল? ব্ল্যাক মার্কেটের সুবিধে না নিয়ে উপায় কী? বেশি কী কথা এই ধরো না সামান্য চিনির ব্যাপারটাই! সংসারে গিন্নি বলেন মাসে অতি কম দেড় মন চিনি তাঁর চা-ই নইলে মানে ওদিকে সে একেবারে বুঝতেই পারছ, ডেডলক, কমপ্লিট ডেডলক। তা এখন কোথায় পাবে তুমি এই চিনি। ওপ্‌ন মার্কেটে যাও, নেই নেই নেই নেই, হাত উলটেই বসে আছে সব দোকানিরা। কোথাও পাবে না তুমি এই চিনি। কী করবে? তা ও বেঁচে থাক বাবা ব্ল্যাক মার্কেট, বেঁচে থাক আমার মজুতদার, না হয় চতুর্গুণই পয়সা নেবে, জিনিসটি তো ঠিক ঠিক পাওয়া যাবে। করব কী বল, পয়সা তো আর সঙ্গে যাবে না।

নির্মলবাবু। সে পয়সা যাদের আছে তারা বলতে পারে এ কথা! কিন্তু সমস্যা হচ্ছে যে বেশির ভাগ লোকেরই আবার নেই কি-না?

২য় ভদ্রলোক। দ্যাখো নির্মলবাবু, অত কথা ভাবতে পারব না বুঝলে, অত কথা ভাবতে পারব না। সংসারে অন্যায় অবিচার দিনরাত চব্বিশ ঘণ্টার ভেতর লাখো লাখো ঘটছে। এখন

সব কিছুর বিরুদ্ধে দাঁড়াতে গেলে নিজের ব্যবসা-বাণিজ্য, কাজকর্ম তো দেখি সব বন্ধ করে দিতে হয়।

নির্মলবাবু। তা দিতে হয় দেবে। তা বলে—যেটা অন্যায় তাকে প্রশয় দিতে হবে?

২য় ভদ্রলোক। দেব! ব্যবসা-বাণিজ্য সব বন্ধ করে দেব! (সহাস্যে) খুব রসিকতা করতে পারো যা হোক তুমি নির্মলবাবু।

[বড়োকর্তা, তৃতীয়ভদ্রলোক সবাই হো হো করে হাসেন।]

বড়োকর্তা। চলো যাই চলো; ভেতরে চলো।

[ভদ্রলোকদের প্রস্থান।]

সঙ্গে সঙ্গে ডাস্টবিনের কাছে স্পটলাইটটা জ্বলে ওঠে। কুকুরটা গর্জে উঠে যেন কাউকে কামড়ে দিলে মনে হয় আর্তনাদ শুনে। দেখা যায় কুঞ্জ তার ক্ষতবিক্ষত হাতখানা তুলে ধরে সামনের দিকে এগিয়ে আসছে।

প্রধান। (অন্ধকারের ভেতর থেকে) দুটো খেতে দাও বাবু। ও বাবারা........

রাধিকা। (সভয়ে) ওমা—একেবারে কামড়ে খেলে গো।

[রাধিকা কুঞ্জর দিকে ছুটে যায় ডাস্টবিনের কাছ থেকে।]

(কুকুরের প্রতি) ভারি পাজি কুকুর তো। কামড়ে দিলে গা! (কুকুরকে) দুর হারামজাদা লক্ষ্মীছাড়া কুকুর। ঝাঁটা মারো মুখে, ঝাঁটা মারো। ছাই খা, ছাই খা। দূর—থু থু—

[আক্রোশে থুথু ছিটোতে থাকে। নেপথ্যে কুকুরের গোঙানি শোনা যায়।]

ওমা এ যে অনেকখানি কামড়ে নিয়েছে দেখছি। ওমা আমার কী হবে গো। ইস্—স্—স্।

[ত্রস্তে পরনের কাপড়টা ছিঁড়ে একফালি ন্যাকড়া বার করে বেঁধে দেয় কুঞ্জের হাতে।]

প্রধান। (নেংটি পরে দাঁড়িয়ে বড়ো বাড়ির দিকে হাত তুলে চেঁচাচ্ছে) আর কত চেঁচাব বাবু দুটো ভাতের জন্য। তোমরা কি সব বধির হয়ে গেছ বাবু—কিছু কানে শোন না? অন্তর কি সব তোমাদের পাষাণ হয়ে গেছে বাবু! ও বাবারা—বাবু—কত অন্ন তোমাদের রাস্তায় ছড়াছড়ি যাচ্ছে বাবু, আর এই বুড়ো মানুষটাকে এক মুঠো অন্ন দিতে তোমাদের মন সরে না বাবু। বাবু—তোমাদের কি প্রাণ নেই বাবু! ও বাবারা, বাবু—ও বাবারা—

[প্রস্থান]

রাধিকা। (কুঞ্জের হাতে ব্যাণ্ডেজ বাঁধতে বাঁধতে) খুব যন্ত্রনা হচ্ছে, না! জল এনে দেব জল? একটু জল খাবে?

কুঞ্জ। না।

কুঞ্জ তাকিয়ে থাকে রাধিকার দিকে সাশ্রুচোখে। রাধিকাও ব্যাণ্ডেজ বাঁধা শেষ করে ফ্যাল ফ্যাল করে কুঞ্জর দিকে চেয়ে থাকে। চোখে তারও জল ভরে আসে সব কিছু স্মরণ করে। গভীর মমতায় রাধিকা শুধু কুঞ্জর কপালের ওপর থেকে বিস্রস্ত চুলগুলো সরিয়ে দেয়। হঠাৎ কেঁদে ফেলে। কুঞ্জ অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে রাধিকার দিকে ; তারপর বাঁ হাতখানা দেয় রাধিকার মাথার ওপর।

(পটক্ষেপ)

চতুর্থ দৃশ্য

(হারু দত্তের বাড়ি। দুপুরবেলা সামনের-বারান্দায় জলচৌকির ওপর উবু হয়ে বসে তামাক টানছে হারু দত্ত। খানিকটা দুরে বারান্দার এক কোণে জনতিনেক অল্প বয়সী গেঁয়ো স্ত্রীলোক গায়ে কাপড় জড়িয়ে বসে আছে। তাদের মধ্যে দুজন পেছন ফিরে বসে আছে। আর একজন, নাম খুকীর মা—বাল্য বিধবা, হারু দত্তের মুখোমুখি বসে বেশ সপ্রগলভ ভাবেই কথা বলে যাচ্ছে। আর একজন প্রৌঢ় গেঁয়ো লোক উঠোনে বসে আছে।)

হারু দত্ত। (হুঁকোয় বিলম্বিত টান মেরে) গাঁয়ের জন্যে আমি কী করেছি আর না করেছি তা জানে রাজ্যের লোক আর (ওপর তাকিয়ে) ভগবান। বেশি কী বলব। নিজের প্রশংসা নিজে করার তো অভ্যাস নেই কোনোদিন!

খুকীর না। সে আর আপনি কী বলবেন বাবা। আমরা তো জানি। (প্রৌঢ় ব্যক্তিকে) এই তো তোমার গিয়ে সেবার খুকীর অসুখের সময়। কবেকার কথা বলছি, এই গত কার্তিক মাসের কথা। ঐ যে , যে-বার ঝাড়ের দশটা বাঁশ বিক্রি করে ফেললাম তোমারে দিয়ে হরোর বাপ্!

চন্দর। (চিন্তিত মুখে) দশটা না আটটা!

খুকীর মা। দশটা। না, সে এখনও আবার সঠিক মনে রয়েছে! দশটা বাঁশ আমি তোমারে বেচলাম। তিন টাকা দু আনা দাম হয়, তা তুমি তখন আমারে দিলে তিন টাকা, আর খুচরো ছিল না বলে দু আনা আর দিলে না। তারপর সেই দুআনা আবার কাটান্ গেল তোমার গিয়ে পাঁচ পালি ধানে।—মনে পড়ছে?

চন্দর। (ঈষৎ হেসে মাথা নেড়ে) হ্যাঁ হ্যাঁ, আমারই ভুল হইছিল বটে, ঠিক ঠিক।

হারু দত্ত। (হুঁকো থেকে মুখ তুলে) মোক্তার হলে পারতিস তুই খুকী মা জজ-কোর্টের।

খুকীর মা। (হেসে) তা আজকালকার মেয়েরা তো বাবা আপনিই বলেনযে, লেখাপড়া শিখে পুরুষ মানুষের সঙ্গো সব পাল্লা দিয়ে আপিস্ কাছারি করছে! তা সে রকম শিক্ষে দীত্রে পেলে বাবাঠাকুর আপনার আর্শীবাদে আমি জজকোর্টের উকিল মোক্তারদের মাথা ঘুরিয়ে দিয়ে আসতাম।

হারু দত্ত। (খ্যাঁক খ্যাঁক করে হেসে) তা তুই পারতিস খুকীর মা, তুই যা মেয়ে (স্নেহভরে দূর থেকে চড় তুলে) তোকে একেবারে........বড্ড দুষ্টু তুই!

খুকীর মা। তা সে যাগ গে, যে কথা বলছিলাম, হ্যাঁ সেই খুকীর অসুখের সময়। পনেরো দিনের দিন মেয়ের তো ঐ অবস্থা! কী করি! গেলাম ছুটে রমানাথ ডাক্তারের কাছে। কত করে বললাম, বলি—চলুন একটুখানি, মেয়েটাকে একবার শেষ দেখা দেখে আসুন ডাক্তারবাবু, ব্যাজ্ঞাতা করি, পায়ে পড়ি! নাঃ, বললে টাকা ফেল তারপর! কী ধম্মডাকাতে লোক গো! কত করে বল্লাম, আজ দিতে পারছি নে টাকা বাবা, দুদিন পরে নেবেন। কিছুতেই না। তারপর কোথায় যাই কী করি, মনে পড়ল বাবাঠাকুর-এর কথা, ছুটে গেলাম। সামনা সামনি বলছি বলে তোমরা হয়তো ভাববে যে বড়ো বাড়িয়ে বলছে মাগী, কিন্তু বাবাঠাকুরের চরণ ছুঁয়ে আমি বলছি—যে এর ভেতরে একরত্তি মিথ্যে নাই।—সে জানেন আমার অন্তর্যামী। (চোখ বোজে) তা সে কী বলব, আমার মুখ দেখেই বাবাঠাকুর জানতে পারলেন। কিছু বলতে হল না। গেলেন; ওষুধ দিলেন, তিন দিনের দিন মরা মেয়ে আমার ঝাড়া দিয়ে উঠল। এমন কী খুকী যে দিন অন্নপত্যি করবে সে দিন নিজে বাড়ি বয়ে এনে চাল পর্যন্ত দিয়ে গেলেন। বল্লেন খুকীর মা, সে রকম পুরোনো চাল তো তোর ঘরে নেই—রাখ এই কটা, খুকীরে দিস। তাও কম করে তোমার সের দুয়েকের কম নয়। —এই রকম দায়ে পড়ে যখনই গিয়েছি, না-বাক্যি কখনও শুনিনি বাবাঠাকুরের মুখে। আর শুধু কি তোমার আমার বেলায়, যে এয়েছে, যে এয়েছে—। তা সে আপনি কী করেছেন আর না করেছেন তা জানি আমরা, আপনি কী বলবেন।

হারু দত্ত। (হুকো থেকে মুখ তুলে) কিছু না, কিছু না। আমি দেখব তোমার আপদে, তুমি দেখবে আমার বিপদে, এ না করলে চলবে কেন!—কী বল চন্দর?

চন্দর। না, তা, সে তো যথার্থই। এর আর কথা কী!

হারু দত্ত। এই যে নিয়ে যাচ্ছি তোমাদের সব, এ কেন। কেন কী দরকার আমার নিয়ে যাবার উদ্যোগ করে! দু-চোখের সামনে সব না খেতে পেয়ে শুকিয়ে মরে যাবে, এ দেখতে পারব না বলেই তো! না হলে এতে করে আমার কী স্বার্থ আছে বল, য়্যাঁ! গাঁটের পয়সা খরচ করে, এরে ধরে, তারে ধরে কেন কী দরকার আমার? ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়িয়ে বেড়াবার দরকার কী! অবিশ্যি হ্যাঁ বলতে পার যে না করলেই পার তুমি—

চন্দর। না—তাই আর একটা কথা হল!

হারু দত্ত। না—এই কথার কথা বলছি। বলি মানুষ তো আর সকলেই তোমার আমার মতো না, মন্দলোকও তো আছে সংসারে, না কী! বলতে পারে—মানুষের মুখ চন্দর তুমি এখন ঠেকাবে কী দিয়ে? আজ্ঞে না, বলে, আস্তে আস্তে ন্যাজ নাড়ে, ঐ বাঘেই তো মানুষ মারে, হুঁ হুঁ—বলতে পারে যে, না করলেই পার তুমি এই পরোপকার। বলে কে তোমারে করতে! কী উত্তর দেবে তুমি এ কথার! অথচ দ্যাখো বোঝে না যে, সব মানুষগুলোই

যদি তাদের মতো হত তো কবে উচ্ছন্নে চলে যেত এই সমাজ সংসার, ধ্বংস হয়ে যেত সব।

চন্দর। (বিস্মিতের ভঙ্গিতে হারু দত্তর চোখে চোখ রেখে) ধ্বংস হয়ে যেত সব!

হারু দত্ত। তা যেত না? (খুকীর মায়ের দিকে তাকায়)

খুকীর মা। হুঁ হুঁ। (হাসে আর মাথা নাড়ে)

হারু দত্ত। তা সব না, সব খারাপ না, ভালো লোক পৃথিবীতে আছে। (জোর দিয়ে) তারাই তো চালাচ্ছে এই জগৎটা। অনেক চন্দর, এখনও অনেক জানবার বোঝাবার আছে এই জগতে—তো ন্যাও এসো এইবার টিপ্ সইটা দিয়ে যাও, এসো এসো।

চন্দর। আবার টিপ সই দিতে হবে?

হারু দত্ত। ওরে বাবারে—তা দিতে হবে না। মানুষের মুখের কথায় জানবে চন্দর কোনো মূল্য নেই, একেবারে কিছু দাম নাই—কথা এই বললে, ফুরিয়ে গেল! না কি! করবে যা তা সব কাগজে কলমে। একবার করলে চিরকালের মত এট্টা ইয়ে হয়ে থাকল! তো নাও এসো এসো। আমার আবার ওদিকে—ওরে কই রে।

[চন্দর উঠে এসে হারু দত্তের সামনের কাগজে একটি টিপ সই দেয়।]

চেপে দ্যাও আঙ্গুলটা, হ্যাঁ, য়্যাঁঃ। যাগগে, ও ঠিক হয়েছে। ওতে কিছু এসে যাবে না। (টিপ-সইটা কাগজ তুলে দেখে) এই তো, দিলে—ফুরিয়ে গেল!

চন্দর। (আবেগ ভরে) বাবা, দেখো আমার মেয়েটা যানো—

[কণ্ঠরোধ হয়ে আসে চন্দরের।]

হারু দত্ত। কিচ্ছু বলতে হবে না, কিচ্ছু বলতে হবে না। সে দায়িত্ব যখন নিইছি আমি—

চন্দর। না, তাই বলছি বাবা, তিন বছর বয়সে মা মারা গেছে, তারপর থেকে বলতে গেলে এক রকম নিজে হাতে করেই—(চোখ মোছে) তা আর আমার গর্বের কিছু থাকল না। (কেঁদে ফেলে)

হারু দত্ত। (কৃত্রিম অভিমানের সুরে জোরে) ফের্ আবার তুই মেয়ের জন্যে দুঃখ করছিস! মেয়ে তোর, মেয়ে আমার না!

খুকীর মা। (চন্দরের প্রতি) দুঃখু কর কেন? মেয়ে তোমার ভালোই থাকবে।

হারু দত্ত। য়্যাঁ—আরে কইরে!

[নেপথ্যে 'যাই বাবু'।]

দুত্তুরি তোর নিকুচি করেছে যাই বাবুর! বলি ঘাটে নৌকা এয়েছে?

[জনৈক ভৃত্যের প্রবেশ।]

ভৃত্য। (সপ্রতিভভাবে) তুলে ফেলব বাবু জিনিসপত্তর সব নৌকায়।

হারু দত্ত। তুলে ফেলব—এতক্ষণ কী করছিলি? গিয়েছিস তো সেই কবে।

ভৃত্য। নৌকা আনতে গিছলাম বাবু ঘাটে।

হারু দত্ত। ওঃ গিছলে তো একেবারে উদ্ধার করেছ আমাদের। ব্যাটা হারামজাদা কোথাকার! নৌকা আনতে কতক্ষণ লাগে! ক'দিনের পথ এখান থেকে? আবার মুখে মুখে তক্ক করছে দাঁড়িয়ে! চোখ নামা, চোখ নামা, ব্যাটা ছুঁচো কোথাকার চোখ নামা!—দিনে দিনে পৌঁছুতে না পারি তো দেখিস'খন তখন।

ভৃত্য। তা ভাটা পড়েছে টেনে যাব'খন।

হারু দত্ত। যাবে তো আর এখানে দাঁড়িয়ে রুপে দেখাচ্ছ কাকে, যাও!

[ভৃত্য প্রস্থানোদ্যত]

আর শোন, তিন দাঁড় করতে বলবি।

ভৃত্য। ভাটা পড়ছে, দু দাঁড়েই মেরে দেব'খন.......

হারু দত্ত। না, আর মেরে দিতে হবে না। তিন দাঁড় করতে বল-গে, এ হে-হে-হে। ভৃত্যের প্রস্থান।

[হুঁকোটি হাতে নিয়ে মেয়েদের প্রতি]

তো এগোও, এগোও তোমরা সব আস্তে আস্তে। নে যা খুকীর মা এদের সব।

[মেয়েদের প্রস্থান।]

তা হলে চন্দর, তোমার হল গিয়ে—(ট্যাঁকে কাপড়ের পুঁটলি থেকে নোট বার করে গুনে দেয়) নাও ধর—

[দ্বিধা দ্বন্দ্বে ভরা চন্দর কুণ্ঠিত হাতে টাকা নেয়]

এখন এই নাও; তারপর ঘুরে আসি আমি—যা দিয়ে যা হয়—(তামাক টানে)

চন্দর । মেয়ে বিক্রি করলাম আমি! মাতিরে আমি বেঁচে ফেললাম। (কেঁদে ফেলে) মাতি, আমার মা, মাতঙ্গিনী—

[চন্দরের প্রস্থান।]

(হারু দত্ত তিন মাথা এক করে জলচৌকির উপর উবু হয়ে বসে টর টর শব্দে তামাক টানে আর চন্দরের দিকে আড়চোখে চেয়ে চেয়ে দেখে।)

(পটক্ষেপ)

পঞ্চম দৃশ্য

সেবাশ্রমের একটি কক্ষ। বিনোদিনী জানলার গরাদ ধরে বাইরের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে চুপ করে; আর নিরঞ্জন ঘরের মাঝখানটার মাটির দিকে মুখ নিচু করে দাঁড়িয়ে

যেন আক্রোশে ফুঁসছে কার ওপর। নিদারুণ একটা প্রতিহিংসা চক্ চক্ করছে নিরঞ্জনের চোখে মুখে।

বিনোদিনীর পরনে মোটামুটি একখানা আধময়লা শাড়ি। নিরঞ্জনের গায়ে ছোট ঝুলের একটা ছিটের হাফ শার্ট, পরনে ন-হাতি একখানা আধময়লা ধুতি। খালি পা, অসংস্কৃত হাবভাবের দরুণ পরিবেশের সঙ্গে মোটেই খাপ খাচ্ছে না যেন কাউকেই।

বিনোদিনী। (হঠাৎ বেগে ঘুরে দাঁড়িয়ে ক্ষুব্ধ স্বরে) শুধু কি এই! সে নির্যাতনের কথা মুখে বলে বোঝানো যায় না।

নিরঞ্জন। (হাতের তালুতে ঘুষি চেপে) এর প্রতিশোধ আমি—(অস্বস্তিতে হাঁপিয়ে ওঠে) আচ্ছাঃ।

বিনোদিনী। (ভাঙা গলায়) মাখন মরণাপন্ন, দিদির অসুখ, মাঠে মাঠে পাগলের মত ঘুরে বেড়াচ্ছে তোমার দাদা—

নিরঞ্জন। (স্বগত) দাদা!

বিনোদিনী। হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে তোমার দাদা, কোথায় একটু ওষুধ, কোথায় একটু পথ্যি,—আর তোমার জ্যেঠা, তার কথা তো বলবারই না— দিনরাত চব্বিশ ঘন্টা কেবল শ্রীপতি-ভূপতির কথা। ঘুর-ঘুট্টি অন্ধকার, চারদিকে সাপখোপের ভয়, মড়কের দেবতা বাতাসের কাঁধে ভর করে কেঁদে বেড়াচ্ছে আগানে বাগানে সাঁই সোঁ—ঘরের বাইরে বেরুতে সাহস করে না মানুষ—কে কার কথা শোনে, বুড়ো অমনি চল্ল বন-বাদাড় ভেঙে, বলে এট্টু খোঁজ করে আসি আমি শ্রীপতি-ভূপতির। সে দেখাও যায় না, সওয়াও যায় না। আর এই অবস্থার ওপর দত্তর সে কী অত্যাচার! জীবনে আমি কোনোদিন সে-সব কথা ভুলব না!

নিরঞ্জন। গাঁয়ে কী কেউ মানুষ ছিল না যে তার প্রতিবাদ করে!

বিনোদিনী। ছিল, কিন্তু দত্তর ওপর কথা বলে কে? জীবন না তার চলে যাবে অপঘাতে।

নিরঞ্জন। (আক্রোশে) অপঘাতে! তো দেখি আজ কোথায় গিয়ে পড়ে সেই অপঘাত, দেখি (পায়চারি করে)

[রাজীবের প্রবেশ]

রাজীব। (নিরঞ্জনকে লক্ষ করে) আরে পাঁয়তারা ভাঁজিস নাকি রে রাখ—(হঠাৎ বিনোদিনীকে দেখে বিস্মিতের ভঙ্গিতে) এইডা কী! রাখহরি! (বিনোদিনীকে) তুমি এইহানো আইছ ক্যান! বলি এইহানো তোমার কী প্রয়োজনটা, য়্যাঁ। আচ্ছা বলতো দেখি বাবু দ্যাখলে কী কইতো। যাও ভিতর যাও। যাও কইত্যাছি আমি তোমারে ভিতরে যাও। যাও।

[নতমুখে বিনোদিনীর প্রস্থান।]

রাখহরি! সুট সুট কইর‍্যা ঘরে ঢুইক্যা ইয়ারে কয় কিডা রে, য়্যাঁ চুপ কইর‍্যা আছস্ অহন, কথা যে কস্ না বড়!

নিরঞ্জন। কী সুট সুট করে ঘরে ঢুকে!

রাজীব। কী তা জানস্ ভালো তুই, আমারে জিগাস করে আহাম্মক। কইত্যাছিলা কি তুই ওয়ারে! ভাবস্ বুইড়্যা কিছু ঠাহর পায় না, না......বেটা প্রেমালাপ করনের আর জায়গা পাইলা না!

নিরঞ্জন। চেঁচাবেন না আপনি শুকনের মতো। আমরা অন্য কথা বলছিলাম।

রাজীব। (দুটো কাঁধ একটু তুলে) কী, কী কইলি! শকুন, আমি চেঁচাই শকুনের মতো, নাকি! খারা তোর ত্যারা ত্যারা কথা আমি ছুটাইয়া দিত্যাছি; খারা। (ঘুরে দাঁড়িয়ে) সিংহের মুখের খাদ্য আর তুই শৃগাল হাত দিচ্ছিস তাইতো! বাবু তোরে আজ করে কী দেহিসনে........বেটা ছুটলোক আস্পর্ধা পাইলে কী আর রক্ষ্ম আছে না!

[বেগে কালীধনের প্রবেশ]

কালীধন। সরকার মশাই যাবেন না দাঁড়ান আপনি। (নিরঞ্জনকে) দাঁড়াও তুমি। (রাজীবের প্রতি) জ্ঞানদার কাছ থেকে আমি কিছু কিছু শুনতে পেয়েছি। ব্যাপার কী আমায় খুলে বলুন সরকার মশাই। বলুন, গোপন করবার দরকার নেই আমার কাছে বলুন!

রাজীব। (মাথা চুলকে) কবা বা কী! কী রে রাখহরি, কথা যে কস্ না অহন, জবাব দে!

কালীধন। (নিরঞ্জনের প্রতি) তুমি জানো এটা সেবাশ্রম!

রাজীব। আমি তো তোমারে বরাবরই কইয়্যা আসত্যাছি কালীধন যে এই ছুটলোকগুলোরে তুমি কখনই প্রশ্রয় দিবা না। তা তো শুনবা না; তা তোমার শোননের জো নাই। আরে এগুলা কি মানুষ!

[নিরঞ্জন রাজীবের প্রতি কটাক্ষ করে।]

কালীধন। (নিরঞ্জনের প্রতি) বেরিয়ে যাও, বেরিয়ে যাও তুমি এই মুহূর্তে এখান থেকে। তোমার মত কর্মচারী আমার কোনো দরকার নেই। (প্রচণ্ড ধমকের সুরে) বেরিয়ে যাও তুমি এখান থেকে।

[নিরঞ্জনের প্রস্থান। বেগে বিনোদিনীর প্রবেশ।]

বিনোদিনী। আমি যাব, আমাকে ছেড়ে দাও। দাও, আমাকে ছেড়ে দাও আমি যাব।

রাজীব। (বাধা দিয়ে) আরে এইডা কী কর! তুমি মাইয়া মানুষ তোমার স্থান হইল অন্দর মহলে। বাইরে যাবা ক্যান। যাও ভিতরে যাও।—কী আশ্চর্য!

বিনোদিনী। ছেড়ে দাও, আমাকে তোমরা ছেড়ে দাও, আমি যাব।—যেতে দাও আমাকে।

কালীধন। জ্ঞানদা!

[জ্ঞানদার প্রবেশ।]

(ইঙ্গিত করে) ভেতরে নিয়ে যাও ওকে।

জ্ঞানদা। (বিনোদিনীর হাত ধরে) চ, আহা ও রকম করতে নেই চ, আ—য়!

[বিনোদিনীর হাত ধরে জ্ঞানদার প্রস্থান। রাজীব গমনোদ্যত]

কালীধন। সরকার মশাই! আপনি ওর পাওনা-গণ্ডা যা হয় মিটিয়ে দিন এক্ষুনি যেমন করে হোক। ওকে আর এখানে রাখা চলবে না—ঘরের লোক যদি বিশ্বাসঘাতক হয় তো—

রাজীব। আরে আমিও তো তাই কই। বলে এই ছুটলোকগুলোরে তুমি প্রশ্রয় দিবা না। কিন্তু তা তো শুনবা না, তোমার যত কারবার হইল এই সব ছুটলোকগুলার সঙ্গে। আরে এগুলো কি মানুষ!

কালীধন। আচ্ছা সে আপনাকে দেখতে হবে না, যান, যা বললাম তাই করুন গিয়ে, যান।

রাজীব। আরে যাইতেছি, আমার লাইগ্যা কি? আমি তো যাইয়াই আছি, হ-অ-অ—

[প্রস্থান।]

কালীধন। হ্যাঁ, তাই যান এখন।.........আচ্ছা কারবার যা হোক। ধীরে সুস্থে যে একটু গুছিয়ে বসব আর কাকেই বা কী বলি; হয়েছেই যত সব।

[একটা বড়ো কুশান চেয়ারে গা এলিয়ে দিল।]

এই কে আছিস্!

[জনৈক ভৃত্যের প্রবেশ।]

ভৃত্য। (সেলাম করে) বাবু।

কালীধন। আচ্ছা কী করিস তোরা সব ওখানে বসে বসে বলত, ডেকে ডেকে সাড়া পাওয়া যায় না!

ভৃত্য। আজ্ঞে সঙ্গে সঙ্গেই তো এসে পড়েছি!

কালীধন। সঙ্গে সঙ্গেই?

ভৃত্য। আজ্ঞে—

কালীধন। চুপ চুপ। বিকেলবেলা কে ছিল, গেটে?

ভৃত্য। বিকেলবেলা, আজ্ঞে আমিই ছিলাম।

কালীধন। রাখহরি এখানে এসেছিল কখন?

ভৃত্য। আজ্ঞে সে তিনি তো এয়েছেন সেই দিনমানে।

কালীধন। দিনমানে!

ভৃত্য। আজ্ঞে।

কালীধন। হুঁ, কিন্তু আর কখনও যেন ওকে সেবাশ্রমে ঢুকতে দেওয়া না হয়!

ভৃত্য। ঢুকতে দেব না!

কালীধন। না, তবে আর বলছি কী, ঢুকতে দিবি নি।

ভৃত্য। যে আজ্ঞে।

কালীধন। আমাকে জিজ্ঞেস না করে কাউকে নি।

ভৃত্য। আজ্ঞে হ্যাঁ।

কালীধন। হ্যাঁ, ঠিক থাকে যেন।

ভৃত্য। আজ্ঞে।

কালীধন। আর রামরতনবাবু এলেই আমাকে একবার—

[নেপথ্যে ঘোড়ার খুরের শব্দ ; বাইরে তাকিয়ে ভৃত্য একটু অন্যমনস্ক হয়ে যায়।]

কী দেখছিস ও দিকে!

ভৃত্য। আজ্ঞে ঘোড়ার গাড়ি করে কারা যেন এলেন মনে হচ্ছে।

কালীধন। ঘোড়ার গাড়ি করে!

ভৃত্য। (একটু লক্ষ করে) আজ্ঞে ঠিক চিনতে পাচ্ছি নে। তবে তিন চারদিন আগে এই দুপুরবেলার দিকে কোট পরা একজন বাবু মতো লোক এইছিলেন, দেখতে অনেকটা তাঁরই মতো— সঙ্গে আবার দু'জন (ভালো করে তাক করে) হ্যাঁ দুজনাই তো, মেয়ে-নোকও রয়েছে দুজনা।

কালীধন। মেয়ে লোকও আছেন! (উঠতে উঠতে) ঘোড়ার গাড়ি করে মেয়ে লোক! কে আবার এল চল্ চল্ তো দেখি।

[ভৃত্যসহ কালীধনের প্রস্থান ত্রস্তে নিরঞ্জন ও বিনোদিনীর প্রবেশ।]

বিনোদিনী। (চাপা সন্ত্রস্ত কণ্ঠে) কারা?

নিরঞ্জন। (ঠোঁটে আঙুল ছুঁইয়ে) চুপ। দত্ত। সেই হারু দত্ত।

বিনোদিনী। হারু দত্ত!

নিরঞ্জন। (শব্দ করে) স্-স্-স্! এই বাবু ওর মহাজন কি না! তাই মাঝে মাঝে আসে এখানে। কিন্তু মেয়ে দুটো—

[বিস্মিতের ভঙ্গিতে তাকায়।]

বিনোদিনী। কারা ওরা?

নিরঞ্জন। ঠিক ঠাওর করতে পারছিনে, তবে দুরে থেকে মুখের আদলটা দেখে মনে হচ্ছে যেন কোথায় দেখেছি দেখেছি। ঠিক স্মরণে আসছে না। তবে দত্তর সঙ্গে যখন এয়েছে তখন ও আমাদের গাঁয়ের মেয়ে না হয়ে যায় না। উঃ শালা—যাক ঠিক আছে এইবার সব কটাকে এক সঙ্গে পেঁচিয়ে —দাঁড়াও।

বিনোদিনী। (অপ্রস্তুত ভাবে) কী করবে কী?

নিরঞ্জন। কিছু না, তুই চুবো। শোন, একেবারে ভেতরে চলে যাবি, ভেতরে গিয়ে চুপ করে বসে থাকবি, বুঝলি? কারো সঙ্গে কোনো কথা কি অন্য কিছু বলবার দরকার নেই। একেবারে চুপ। আমি চল্লাম।—

[গমনোদ্যত]

বিনোদিনী। আচ্ছা......কিন্তু তুমি চললে কোথায় তুমি?

নিরঞ্জন। সে বলব'খন পরে, কিন্তু ঐ যা বললাম, যা পালা শিগগির—

[নিরঞ্জনের দ্রুত প্রস্থান]

[জ্ঞানদার প্রবেশ।]

জ্ঞানদা। ওমা আমার কী হবে গো! তুই এখানে এমন একলাটি দাঁড়িয়ে কেন লা। যা ভেতরে যা, ভেতরে যা। ভদ্দরলোকেরা আসবে এখন, যা ভেতরে যা!

[বিনোদিনীর প্রস্থান।]

(বাইরে তাকিয়ে বড়ো বড়ে চোখ করে) আবার কে এল গা, কারা? (একটু দেখে ঠাওর করতে না পেরে) যাগ্‌গে বাবা, অত কথায় কাজ কী আমার, য়্যাঃ।

[হাত-ধরাধরি করে হারু দত্ত ও কালীধনের প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে ঘোমটা টেনে ত্রস্ত পায়ে জ্ঞানদার প্রস্থান।]

কালীধন। (হাসতে হাসতে) তাই আমি ভাবি, যে সেই যে গেল দত্ত—এ দত্তর চিঠি নেই পত্তর নেই। ওরে তামাক দে রে।

হারু দত্ত। (হেসে) আরে ভাই সে ঝামেলার কথা আর বল কেন! এই দেব দিচ্ছি করতে করতেই সকাল থেকে রাত এগারটা অবধি নিঃশ্বেস ফেলবার সময় পেইছি কোনোদিন! ওদিকে মহাজনের তাগিদ, কন্ট্রাক্টরের চাহিদা, তারপর আবার তোমার গিয়ে এই—(হেসে) একেবারে ব্যতিব্যস্ত সদা সর্বদা।

কালীধন। মহাপুরষ তুমি হারু দত্ত। এতগুলো তাল তুমি সামলাও কী করে এক হাতে। চাড্ডিখানি কথা নয়।

হারু দত্ত। সামলাতে হয় ভাই ; সামলাতে হয়। না সামলে উপায় কী বলো! খেটে যখন খেতে হবেই তখন..........

কালীধন। (সহাস্যে) উ—ঃ—ঃ বড্ড জোর বলেছ হে য়্যাঁ, আরে তা হলে আমরা দাঁড়াই কোথায়!

হারু দত্ত। (কালীধনের উরুতে ঠেলা মেরে) যাঃ, কী যে বল মাইরি.......

কালীধন। তা বেশ তো হল, এইবার শহরে একখানা বাড়ি-টাড়ি, বল তো দেখি—সস্তায়-মস্তায় করে দি। লোক আছে আমার হাতে।

[আন্তরিকতার আধিক্য হেতু হারু দত্তের গলার ঘামাচি মেরে কালীধন দত্তর মুখের দিকে চেয়ে রইল।]

হারু দত্ত। (বিস্মিতের ভঙ্গিতে) কী, শহরে বসবাস! না বাবা, ও আমার ধাতে সইবে না। আরে ভাই আমরা হচ্ছি তোমার যাকে বলে গিয়ে জাত গেঁয়ো লোক, ও শহরে চালচলন বরদাস্ত হবে না আমাদের ধাতে।

[ভৃত্য তামাক দিয়ে গেল।]

কালীধন। (হারু দত্তর গায়ে ঠেলা মেরে) গেঁয়ো চালচনটা কী রকম! (খ্যাক খ্যাক্ করে হাসি) গেঁয়ো চালটা শহরে চালের চেয়ে কী কম বাবা—(আরও হাসি) উ-রি বাবারি বাবারি; আশ্চর্য করে দিলে তুমি আমায়—

[সহসা মুখের হাসি মুখেই মিলিয়ে গেল।]

[দারোগা ও জনকয়েক কনস্টেবল সহ নিরঞ্জন এবং কতিপয় ভদ্রব্যক্তির প্রবেশ।]

দারোগা। আপনার নাম কালীধন ধাড়া?

কালীধন। (দারোগার দিকে তাকিয়ে) আজ্ঞে হ্যাঁ, কিন্তু—

[হারু দত্তের দিকে তাকায়।]

দারোগা। আশ্চর্য হলে নাকি!

কালীধন, হারু দত্ত অপ্রস্তুতভাবে উঠে দাঁড়ায়। হারু দত্তর চোখ দুটো বড় হয়ে ওঠে শঙ্কায়।

কালীধন। তা আপনারা এখানে...

দারোগা। হ্যাঁ, আমরা বুঝতে পারছেন না, (হারু দত্তকে) আপনার নাম কী?

হারু দত্ত। এই সেরেছে, (দারোগার দিকে ঘুরে অপ্রতিভভাবে) আমার নাম বলছেন?

দারোগা। হ্যাঁ হ্যাঁ, কী নাম আপনার—

হারু দত্ত। আমার নাম হারানচন্দ্র দত্ত।

১ম ভদ্রলোক। হারানচন্দ্র দত্ত! কেষ্ট ঠাকুরের শত নাম।

দারোগা। পুরানচন্দ্র দত্ত হারু দত্ত, কেমন?

হারু দত্ত। (থতমত খেয়ে) আজ্ঞে হ্যাঁ।

দারোগা। হুঁ, (কালীধন ও হারু দত্তর প্রতি) মেয়েদের কোথায় রেখেছেন?

কালীধন। (বিস্মিতের ভঙ্গিতে) মেয়েদের? কী বলছেন স্যার! এটা সেবাশ্রম।

দারোগা। হ্যাঁ, তা সেবাশ্রমে মেয়ে থাকবে না?—বিশেষ উদ্যোগী যখন আপনারা, য়্যাঁঃ! বলুন বলুন চট্ করে বলুন, নইলে ফ্যাসাদে পড়তে হবে বলে দিচ্ছি। বলুন।

১ম ভদ্রলোক। ধান চালের কারবারের সঙ্গো সঙ্গো সবার সাত রকম ব্যবসা ফেঁদে বসেছে দেখছি। সাংঘাতিক খুনে তো।

দারোগা। বলুন! (রাখহরির প্রতি) কই, যাও তো তুমি কনস্টেবলদের নিয়ে ভেতরে গিয়ে বার করে নিয়ে এসো সব মেয়েদের।

নিরঞ্জন। এসো তোমরা সব আমার সঙ্গো।

[কনস্টেবলগণ ও নিরঞ্জনের প্রস্থান।]

ভদ্রলোক। উঃ, একেবারে চারদিক থেকে লক্ষ্মীলাভের ব্যবস্থা আর কী। ধানচালের কারবারের সঙ্গো সঙ্গো সবার... এই লোকটাই তো সেদিন মশাই আমাকে চাল দেয়নি। অথচ গুদামজাত করে রেখেছে যে কত হাজার মণ চাল তার ইয়ত্তা নেই। কিন্তু চান, দেখবেন অমনি হাত উলটে বলবে—নেই। ঠগ কোথাকার!

[দারোগা সব নোট করে নেয়।]

কালীধন। বলুন, বলে নিন। আমাদের কথার যখন কোনো মূল্যই নেই তখন—

ভদ্রলোক। মূল্য নেই, মূল্য রেখেছ? খুনে কোথাকার! (দারোগার প্রতি) দেখুন না মশাই, মাঝে মাঝে এমন ভাব দেখায় যেন সাধু পুরুষ সব, যত অন্যায় অত্যাচার করছি আমরা ওদের ওপর। উঃ, সার্থক জোচ্চোর তোমরা বাবা। ভিটেয় ঘুঘু চরাতে তোমরাই পারো।

দারোগা। (ভদ্রালোকের প্রতি) আঃ!

[নিরঞ্জন, চন্দরের দুই মেয়ে, বিনোদিনী, জ্ঞানদা, রাজীব, কনস্টেবলদ্বয় ও ভৃত্যের প্রবেশ। এই সমস্ত লট!]

নিরঞ্জন। না, (চন্দরের দুই মেয়েকে দেখিয়ে) এই এঁরা দুজন হচ্ছেন আমাদের গাঁয়ের মেয়ে, ঐ দত্ত এদের চুরি করে নিয়ে এসেছে।

হারু দত্ত। চুরি করে আনেনি দত্ত।

দারোগা। আপনি চুপ করুন। (নিরঞ্জনকে) হ্যাঁ তারপর বল।

নিরঞ্জন। (বিনোদিনীকে দেখিয়ে) আর উনি হচ্ছেন আমার ইস্ত্রী। পেটের দায়ে শহরে এসে উঠলে পরে ঐ বাবুর লোকদের চোখে পড়ে এখানে এসে ওঠে।—আমি এখানে ঐ বাবুর দোকানেই একজন গোমস্তা—তাই হঠাৎ একদিন সাক্ষাৎ হয়ে যেতেই আমি বল্লাম বলি তুমি এখানে তা বললে—

দারোগা। যাক সে উপন্যাস পরে শোনা যাবে। আপাতত তুমি বলছ যে উনি তোমার স্ত্রী কেমন?

নিরঞ্জন। আজ্ঞে হ্যাঁ, ধর্মকথা। (বিনোদিনীকে) কী গো বল না!

[বিনোদিনী নড়ে চড়ে দাঁড়ায়।]

দারোগা। (হেসে) যাকগে, তারপর, তুমি এই বাবুর গোমস্তার কাজ করতে?

নিরঞ্জন। আজ্ঞে হ্যাঁ, চালের গুদোমে কাজ করতাম।

দারোগা। গুদোমে মানে দোকানে।

নিরঞ্জন। হ্যাঁ তা, মানে আমি গুদোমেই কাজ করতাম কিনা।

দারোগা। গুদোমে, তা কী পরিমাণ চাল আছে এখনও সেখানে?

[হঠাৎ চাঞ্চল্য দেখা যায় কালীধনের চোখে-মুখে]

নিরঞ্জন। তা সে বিস্তর মণ।

ভদ্রলোক। বিস্তর মণ মানে আন্দাজ কত মণ।

নিরঞ্জন। তা সে আপনার গিয়ে সওয়া লাঘ মণটাক হবে।

দারোগা। স-ও-য়া লা-খ মণ!

নিরঞ্জন। (থতমত খেয়ে) মানে আমি এট্টা আন্দাজে বললাম কম বেশিও হতে পারে।

দারোগা। দ্যাট্স্ অল্ রাইট। (রাজীবকে লক্ষ্য করে, নিরঞ্জনকে) উনি কে?

নিরঞ্জন। উনি ঐ বাবুর ডান হাত, সরকার মশাই।

ভদ্রলোক। (শ্লেষভরে) উনি নাকি আবার জজ ম্যাজিস্ট্রেট সব ট্যাঁকে রাখেন বলেন।

দারোগা। আচ্ছা!

রাজীব। এই আমি ঐ কথা কই নাই।

দারোগা। চুপ করুন আপনি। (কনস্টেবলগণকে) এই তিনোকো হাতকড়ি লাগাও।

(কনস্টেবলগণ কালীধন, হারু দত্ত ও রাজীবকে হাতকড়ি পরিয়ে দিল।
হারু দত্ত ও কালীধন পরস্পরের দিকে তাকিয়ে আকারে ইঙ্গিতে
এমন ভঙ্গি করল যেন হাতকড়ি ছাড়িয়ে আসতে তাদের কোনোই অসুবিধে হবে না।)

৪৭.১০ সারাংশ ঃ (নবান্ন ঃ দ্বিতীয় অঙ্ক)

যুদ্ধ বন্যা মহামারী আর এরই কোলে স্বচ্ছন্দ বর্ধিত, কালনাগ রূপ হারু দত্তের অত্যাচারে অতঃপর প্রধান সমাদ্দার হয় ঘর ছাড়া, গ্রাম ছাড়া। গোটা পরিবারটা অসহায়তার সমুদ্র সাঁতরে এসে ওঠে শহরের এক পার্কে। অসংখ্য ভিখিরিদের ভিড়ে আত্মসম্মান বোধটুকু বিসর্জন দিয়ে বেঁচে থাকতে চেয়েছিল সকলে একসঙ্গে মিলে। সেখানেও অশমি সম্পাত ঘটে গেল। এই অশনি সম্পাতে গোটা পরিবারটা বিশ্লিষ্ট হয়ে গেল দুটি টুকরোয়। বাজার খোলায় খিচুড়ি দেওয়া হবে, অন্যান্য ভিখিরিদের সঙ্গে সেই দিকে যায় কুঞ্জ, রাধিকা। আর ঘটনার অভিঘাতে মস্তিষ্কের ভারসাম্যবিহীন সমাদ্দার পরিবারের জ্যেষ্ঠ ব্যক্তি বয়স্ক প্রধান সমাদ্দারও অন্যান্য ভিখিরিদের পিছু পিছু সেও কোথায় যায়। ক্ষুধার আতিসহ্য দুর করবার আত্যন্তিক আগ্রহে তারা সকলেই বিস্মৃত হয়ে গেছে বিনোদিনীর কথা। বিনোদিনীকে তাই পিছনে ফেলে চলে গেল তারা। 'এমন সময় হন্দদন্ত হয়ে বিনোদিনী প্রবেশ করল।' কুঞ্জ, রাধিকা, প্রধানকে না দেখে অবাক হ'ল। 'ওমা এরা সব গেল কোথায় গো।'

[দ্বিতীয় অঙ্ক, দ্বিতীয় দৃশ্য]

অতঃপর বিনোদিনী গিয়ে পড়ল টাউটের পাল্লায়। সে অসহায় বিনোদিনীকে খাবার থাকবার বন্দোবস্ত করে দেবার নাম করে নিয়ে এসে তুলে দিল কালীধন ধাড়ার সেবাশ্রমে।

কালীধন ধাড়া একজন চালের চোরাকারবারী। সর্বগ্রাসী বিশ্বযুদ্ধের অবদান। অল্প পয়সায় চাল কিনে গুদামজাত করে সে বেশি পয়সায় বিক্রি করে গুপ্তপথে। তার গুদোমে চালের যোগান দেয় দালাল হারু দত্ত। সেও টাকার লোভ দেখিয়ে গ্রাম থেকে ধান চাল সংগ্রহ করে সবিশেষ কম দামে, অভাবের সুযোগে লোককে ঠকায় আবার সুযোগমত জমি ধরে টান মারে। নিজের জন্যে মোটা মুনাফা রেখে কালীধনের গুদামে তুলে দেয় বস্তা বস্তা চাল। কালীধন তার ওপর লাভের মোটা অঙ্ক চাপিয়ে দাম বাঁধে আকাশছোঁয়া, সাধারণ মানুষের ধরাছোঁয়ার বাইরে চলে যায় চাল। এইভাবে কৃত্রিম উপায়ে জিনিসপত্রের দাম বেড়ে যায়। কেবলমাত্র সস্তা হয়ে যায় মানুষের জীবন। গরীব দুঃস্থ বাবার অবিবাহিত মেয়ে বা অভাবগ্রস্ত স্বামীর অল্পবয়সী বৌ অতি সস্তায় চলে আসে কালীধনের সেবাশ্রমে। হারু দত্ত চালের চোরাকারবারের সঙ্গে এ কারবারটাও করে গুছিয়ে। সেও চালের সঙ্গে অল্পবয়সী মেয়েদের কিনে নিয়ে কালীধনের সেবাশ্রমে মেয়ে সরবরাহ করে।

কালীধনের এই সেবাশ্রমে হারু দত্তছাড়া মেয়ে সরবরাহ করবার জন্য অনেক দালালচক্র শহরের অলিগলিতে, পথে পার্কে ঘোরাফেরা করে। এমনি এক দালাল সমাদ্দার পরিবার থেকে বিশ্লিষ্ট বিনোদিনীকে পার্ক থেকে তুলে এলে কালীধনের সেবাশ্রমে বিক্রি করে দিয়ে যায়! এখানে বিনোদিনী অতর্কিতভাবে মিলিত হয় তার স্বামী নিরঞ্জনের সঙ্গে।

[দ্বিতীয় অঙ্ক, পঞ্চম দৃশ্য]

নিরঞ্জন প্রধান সমাদ্দারের কনিষ্ঠ ভ্রাতুষ্পুত্র। সে সমাদ্দার পরিবারে বিপর্যয়ের পূর্বে স্ত্রী এবং অন্যান্যদের ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছিল উপার্জনের আশায়। বাড়ি থেকে চলে এসে কাজ নিয়েছিল কালীধন

ধাড়ার চালের গুদামে। হঠাৎ একদিন চালের গুদাম থেকে এসে উঠেছিল কালীধন ধাড়ার সেবাশ্রমে। এখানেই সে মিলিত হয় বিনোদিনীর সঙ্গে।

বিনোদিনীর কাছে সেবাশ্রমের অবৈধ এবং ন্যক্কারজনক বিবরণ শুনে সে ক্ষিপ্ত হয়। ফন্দি আঁটে বিনোদিনীর সঙ্গে। থানাতে গিয়ে সেবাশ্রমের সমস্ত নোংরা বিবরণ, কালীধনের গুদোমে গুদামজাত চালের পরিমাণ এবং কালো বাজারে সেই চাল বেশি দামে বিক্রির বিবরণ পেশ করে। সেই সঙ্গে চাল ও মেয়ে সরবরাহকারী হারু দত্তের নামও উল্লেখ করে। ঘটনাচক্রে সেই ব্যক্তিটিও থানায় এসে পড়ে, যে কালীধনের চালের দোকানে চাল কিনতে গিয়ে কালীধনের চাহিদামত অর্থ দিতে পারেনি বলে একদিন বিতাড়িত হয়েছিল।

সমস্ত বিবরণ শুনে দারোগা সাক্ষীসহ নিরঞ্জনকে নিয়ে অতর্কিতে কালীধনের গুদামে হানা দেয়। সেইদিনই হারু দত্ত দুটি কিশোরীকে তার অভাবী বাবার কাছ থেকে অল্প টাকায় কিনে এনে তুলেছিল কালীধনের সেবাশ্রমে। দারোগা বামালসমেত কালীধন এবং হারু দত্তকে ধরে ফেলে। হাতকড়া পরিয়ে থানায় নিয়ে যায়।

[দ্বিতীয় অঙ্ক, পঞ্চম দৃশ্য]

নিরঞ্জন বিনোদিনী তারপরে চলে আসে তাদের গ্রামে, আমিনপুরে। বন্যা এবং দুর্যোগ তখন কেটে গেছে। গ্রামে ফিরে তারা তাদের ভাঙা ঘরখানা জুড়ে তেয়ে "আবার বাসোপযোগী করে নিয়েছে।" গ্রামে থাকা বা ফিরে আসা চাষীদের সঙ্গে মিলেমিশে মাঠে চাষ করে। ফসল কেটে ঝেড়ে ধান গোলায় তোলে।

অপরদিকে, প্রধান, কুঞ্জ, রাধিকা পার্ক থেকে পথে পথে ঘুরতে ঘুরতে লোকের বাড়ি উচ্ছিষ্ট ও ফ্যান ভিক্ষে করতে করতে এসে পড়ে এক বড়লোকের বিরাট বাড়ির সামনে। সেদিন সে বাড়িতে বিবাহের বিরাট উৎসবের আয়োজন। বাড়ির বাইরে দাঁড়িয়ে একমুঠো ভাতের জন্য অনেক চিৎকার করে। কাতর প্রার্থনা জানায় একটু খাবারের জন্য। প্রধান নেংটি পরে দাঁড়িয়ে বড়ো বাড়ির দিকে হাত তুলে চেঁচাতে থাকে, 'আর কত চেঁচাব বাবু দুটো ভাতের জন্যে। তোমরা কি সব বধির হয়ে গেছ বাবু—কিছু কানে শোন না? অন্তর কি সব তোমাদের পাষাণ হয়ে গেছে বাবু! ও বাবারা—বাবু—কত অন্ন তোমাদের রাস্তায় ছড়াছড়ি যাচ্ছে বাবু, আর এই বুড়ো মানুষটারে একমুঠো অন্ন দিতে তোমাদের মন সরে না বাবু! বাবু—তোমাদের কি প্রাণ নেই বাবু! ও বাবারা, বাবু—ও বাবারা... ' কিন্তু বিবাহের উৎসবে মত্ত মানুষদের কানে সে কাতর প্রার্থনা পৌঁছয় না।

[দ্বিতীয় অঙ্ক, তৃতীয় দৃশ্য]

বাড়ির বড়ো কর্তা এবং তার বড়লোক বন্ধুরা তখন পারস্পরিক বৈভব আর প্রাচুর্যের ঔদ্ধত্যপূর্ণ প্রতিযোগিতায় উন্মত্ত। ভিখিরিদের প্রতি একটু করুণা বিতরণের সহৃদয় অন্তঃকরণটা চোরাপথে উপার্জিত তাদের ঐশ্বর্যের চাপে বিকৃত বিকলাঙ্গ হয়ে গেছে। এখান থেকে একরাশ নৈরাশ্য আর হতাশা বুকে নিয়ে পেটভর্তি ক্ষুধায় কাতরাতে কাতরাতে কুঞ্জ আর রাধিকা এসে ওঠে এক লঙ্গারখানায়। এখানে আসবার আগে প্রধান মানসিক চাপে, অনেকটা ভারসাম্য হারিয়ে দলছুট হয়ে গিয়েছিল।

৪৭.১১ মূলপাঠ ☐ নবান্ন ঃ তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

(নিখরচার লঙ্গরখানা। ম্যারাপের থামে পোস্টার লটকানো—ফ্রি-কিচেন। মঞ্চের গভীরে বহু নিঃস্ব নিরন্ন ভিড় করে বসে আছে। চুপ করে নেই কিন্তু কেউ-ই। কথায় বার্তায় ভাবভঙ্গিতে সবাই মুখর করে তুলেছে পরিবেশ। সামনের দিকে দেখা যাচ্ছে কুঞ্জ ও রাধিকাকে। হঠাৎ নেপথ্যে থেকে জনৈক ভিখারিনীর তীব্র আর্তকণ্ঠ শোনা যায়। সঙ্গে সঙ্গে সবাই উৎকর্ণ হয়ে ওঠে অঝানা শঙ্কায়। কারো কারো চোখ দুটো বড়ো বড়ো হয়ে মুখটা ফাঁকা হয়ে যায়। জনৈক রোগশীর্ণ বৃদ্ধ ভিখারী তিন মাথা এক করে বসে কাশে, কাশে আর মাঝে মাঝে মুখ তুলে বিশ্ব সংসারের পায়ের তলা থেকে মাথা পর্যন্ত চেয়ে দেখে।)

১ম ভিখারিনী। (নেপথ্যের চিৎকার ক্ষীণতর হয়ে এলে) দ্যাখো দিনি কাণ্ড হুঁঃ (আশেপাশের পাঁচ জনের প্রতি) আচ্ছা, নিবি তো সব একসঙ্গে করে ধরে নিয়ে যা না বাপু, য্যাঁ. সেই না কথা! তা না কেউ পড়ে থাকল, কেউ গেল, এ কী রকম ধারা বে আক্কেলে কাণ্ড! (চেঁচিয়ে মেয়েডারে নিয়ে গেলি অথচ মা বিটিরে ফেলে রেখে গেলি রাস্তায়, এট্টা প্রাণে এট্টা কথা বলল না!

১ম ভিখারি। (উৎকর্ণ হয়ে) তা চেঁচাচ্ছে কেন, ওরকম করে?

১ম ভিখারিনী। ওমা, ধরে নিয়ে যাচ্ছে তা চেঁচাবে না। কী বলে!... ধরে ধরে নিয়ে গিয়ে সব ইনজিশন দিয়ে দিচ্ছে। আমি জানি।

জনৈক বৃদ্ধ ভিখারি। (কাশতে কাশতে) ও সব ধরে নিয়ে যাবে। কেউ থাকবে না। এইবার যে যেখানে পারো পালাও! পালিয়ে যাও সব। নইলে যে ভাবছ নঙ্গরখানার ভিতরি আছ বলে তোমাদের সব ছেড়ে দিয়ে চলে যাবে, হে হে হে হে (হেসে) সে ভেবো না মনে। ও সব ধরে নিয়ে যাবে। পালিয়ে যাও এইবার। সময় থাকতে চলে যাও! সময় থাকতে চলে যাও সব।

কুঞ্জ। যাচ্ছে নিয়ে কোথায় সব নরি ভরতি করে!

২য় ভিখারি। কী জানি! কেউ বলছে ধরে ধরে নাকি সব যুদ্ধে নিয়ে যাচ্ছে। আবার কেউ বলছে সমথ চাষী লোক যারা তাদের সব দেশ ঘরে পাঠিয়ে দিচ্ছে!

১ম ভিখারিনী। ইনজিশন্ দিয়ে আবার মেরেও ফেলছে অনেক।

কুঞ্জ। দূর ও মিথ্যে কথা।

২য় ভিখারি। না তা বলা যায় না, হতে পারে।

কুঞ্জ। পাগল, না মাথা খারাপ। আরে যে ইনজিশনে মানুষ মরে, প্রাণঘাতী হলেও তো

তার নিজস্ব এট্টা দাম আছে। আর তোমার আমার জীবন—কী দাম আছে এ জীবননের? কিছু না। এমনিই বলে তাই উজোড় হয়ো গেল, য্যাঃ।

২য় ভিখারি। তো নরি ভরতি করে নিয়ে যাচ্ছে কোথায় সব ধরে-ধরে?

৩য় ভিখারি। শুনি তো অনেক কথাই। কেউ বলে ধান নাকি এবার এত হয়েছে যে কাটবার পর্যন্ত লোক পাওয়া যাচ্ছে না। তাই চাষী লোকদের সব গেরামে পাঠিয়ে দিচ্ছে। আবার শুনছি—

কুঞ্জ। তার চাইতে ও নিজের থেকে হেঁটে চলে যাওয়াই ভালো, একেবারে পায়দলে। কাজ কী গিয়ে মিছে অত হাঙ্গামায়।

২য় ভিখারি। হ্যাঁ, ও নরিতে করে আবার কেডা কোন্‌দিকে নিয়ে যায় তার ঠিক নেই!

কুঞ্জ। (হাত তুলে) হ্যাঁ এই বাগে একেবারে সিধে গিয়ে ওঠ উত্তরে, নেই কোনো ঝামেলা।

২য় ভিখারি। কোন্ দিকে বললে?

কুঞ্জ। (হাত দিয়ে ইঙ্গিত করে) কেন সোজা এই উত্তরে।

২য় ভিখারি। তোমাদের উত্তরে? আমাদের দক্ষিণে। পাঁচ মহল্লার নাম শুনছ!

কুঞ্জ। পাঁচ মহল্লা।

২য় ভিখারি। হ্যাঁ, তা দূর আছে এখান থেকে।

বৃদ্ধ ভিখারি। সেই কথাই তো ভাবি, যে নড়ে বসতে পারিনে, অথচ এতটা পথ এ আমি কেমন করে পাড়ি দেব? কী গতি হবে আমার? (কাশতে কাশতে) না শেষ পর্যন্ত রেখে যেতে হবে হাড় কখানা এখানেই—(আর্তকণ্ঠে) তোমরা সব চলে যাও। আমারে ছেড়ে চলে যাও, ভূলে যাও আমারে। ভোল আমারে—

[নেপথ্যে ঘন্টাধ্বনি।]

২য় ভিখারি। হোই আবার ঘন্টা দেছে, আবার ঘন্টা দেছে।

১ম ভিখারিনী। বেজেছে এতক্ষণে—বাব্বা, ঘন্টা দিতে একেবারে বেলা হেলিয়ে দেছে আজ। চ, চ।
[কুঞ্জ, রাধিকা ও বৃদ্ধ ভিক্ষুক ভিন্ন অন্য সকলের মেটে হাঁড়িকুড়ি সহ ত্বরিতপদে প্রস্থান।]

বৃদ্ধ ভিখারি। (আর্তকণ্ঠে) আমার সময় হবে না, তোমরা সব চলে যাও। (একটু সুরে) গাঁয়ে ফিরে যাও।

কুঞ্জ। (রাধিকার প্রতি) গাঁয়ে ফিরে যাব কথাটা মনে করলে সে বুকের ভেতরটা একেবারে আমার, এই দ্যাখ না, হাত দিয়ে দ্যাখ বুকে, দ্যাখ— (রাধিকার হাতখানা নিজের বুকে চেপে ধরে) দেখিছিস—!

রাধিকা। (চিন্তান্বিতা মুখে) সত্যিই তো।

কুঞ্জ। (করুণ হেসে) হেঃ, কী যে আনন্দ হয় বউ আমার, সে আমি তোরে—চল্ বউ আমরা গাঁয়ে ফিরে যাই। এ পোড়া মাটির দেশে আর থাকব না। চল ফিরে যাই।

রাধিকা। চল না, আমার কি অসাধ। গাঁয়ে ফিরে যাব, সে তো আমার সৌভাগ্যির কথা। কিন্তু কোথায় যাব? (কেঁদে ফেলে) সেখানকার মাটিও তো পুড়ে গেছে আমার ভাগ্যে—যদি আমার মাখন থাকত—(কাঁদে)

কুঞ্জ। ও সব হবে বউ, সব হবে। দুঃখ করিস নে। চল চল, বউ আমরা ফিরে যাই। এ পোড়া মাটির শহরে আর থাকব না।

বৃদ্ধ ভিখারি। (আর্তকণ্ঠে সুর করে) মিথ্যে বসে আঁকড়ে থাকা, তোমরা সব চলে যাও। তোমরা সব চলে যাও।

কুঞ্জ। বউ!

[রাধিকা কুঞ্জর দিকে জলভরা চোখে তাকায়।]

রাধিকা। কী।

কুঞ্জ। ওঠ, চল।

রাধিকা চল।

[কুঞ্জর হাত ধরে রাধিকা এগিয়ে চলে।]

বৃদ্ধ ভিখারি। (আর্তকণ্ঠে সুর করে) দুরুস্তরের পথে আঁকা বাঁকা, তোমরা চলে যাও। তোমরা সব চলে যাও। তোমরা চলে যাও।

[কুঞ্জর হাত ধরে রাধিকা এগিয়ে চলে।]

(পটক্ষেপ)

দ্বিতীয় দৃশ্য

চিকিৎসাকেন্দ্র। দরদালানের মতো লম্বা একখানা ঘরের দু-পাশ দিয়ে সারবন্দী ভাবে সব খাটিয়া পাতা রয়েছে। সবগুলি বেডেই রোগী ভরতি। ঘরের মাঝখানটায় একজন নার্স একখানা চেয়ারে বসে আছে মাথায় হাত রেখে, কনুই দুটো তার সামনের টেবিলটা ছুঁয়ে আছে। টেবিলটার ওপর ওষুধপত্রের বোতল, চিকিৎসার সরঞ্জাম, খাতা-পত্র ঠাসা। দুজন রোগী শুয়ে শুয়ে অদ্ভুত শব্দ করে আর্তনাদ করছে। নার্সটি থেকে থেকে রোগীদের দিকে ঘাড় বেঁকিয়ে তাকাচ্ছে।

হল-ঘরের সামনে ডানদিক স্বতন্ত্র একটু স্বল্প-পরিসর বারান্দা। বারান্দার মাঝখানে ছোট্ট একটা টেবিল; দুখানা চেয়ার ও একখানা বেঞ্চ। দেওয়ালে কাঠের র‍্যাকে কোট ঝুলছে দেখা যাচ্ছে। একজন যুবক ডাক্তারকে কাজে ব্যস্ত দেখা যাচ্ছে 'আউটডোরের' রোগীদের নিয়ে। বারান্দা থেকে নিচে

নেমে যাবার সিঁড়ির ওপর নিঃস্ব রোগীরা ভিড় করে বসে আছে। একজন কম্পাউন্ডারকে ওষুধের টেবিলের কাছে কাজে ব্যস্ত দেখা যাচ্ছে। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ভদ্রলোক রোগীরা সব বসে আছেন ডাক্তারের টেবিলের সামনের দিকে বেঞ্চের ওপর—হাতে সব শিশি। চিকিৎসাপ্রার্থী জনৈক ভদ্রলোকের সঙ্গে রয়েছে মাথা মুখ ব্যাণ্ডেজ করা দশ বারো বছরের একটা ছেলে।

পায়ে পট্টি জড়ানো, মাথায় পাগড়ি আর গায়ে কোট পরা জনৈক জমাদার গোছের লোক খবরদারি করছে জনতাকে।

হল-ঘরের পেছন দিককার বেড়ের এক নম্বর রোগীর কাতর আর্তকণ্ঠ শুনে নার্স উঠে দাঁড়াল। এগিয়ে গেল, তুলিতে করে কী একটা ওষুধ নিয়ে। একটু পরেই আবার ফিরে এসে টেবিলের কাছে একখানা খাতায় কী যেন লিখছে, এমন সময় রোগীরা আরও জোরে চেঁচিয়ে ওঠে। নার্স। (রোগীদের দিকে মুখ করে ধমকের সুরে) কী হচ্ছে, কী!

ধমক খেয়ে আঁই-আঁও শব্দ করতে করতে এক নম্বর রোগী চুপ করে যেতে নার্স অন্য রোগীদের দিকে এগিয়ে গিয়ে ঘড়ি মিলিয়ে নাড়ি দেখতে থাকে। হল-ঘরের ভেতরে ক্ষণকালের জন্য নেমে আসে কবরের প্রশান্তি। একেবারে চুপচাপ, একটু পরেই আবার অন্যদিক থেকে দু-নম্বর রোগী ওঁ ওঁ শব্দে আর্তনাদ করে উঠে চুপ করে গেল। নার্স একনজর তাকিয়ে নাড়ি দেখে চলে—সব রোগীদের এক এক করে। এই গেল হল-ঘরের ভিতরের অবস্থা। আর বাইরের বারান্দায় সাহেবি পোশাক পরা যুবক ডাক্তারটি রোগীদের বুকে এক এক করে স্টেথস্কোপ লাগিয়ে চোখ টেনে পিট বুকে আঙুল ঠুকে "নিঃশ্বাস নাও" "নিঃশ্বাস নাও" বলে পরীক্ষা করে চলে আর প্রেস্‌ক্রিপশন লিখে দেয়। প্রেস্‌ক্রিপশন হাতে করে রোগীরা আবার কিউ-এ গিয়ে দাঁড়াচ্ছে ওষুধ নেবে বলে। ধুতি সার শার্ট পরা কম্পাউন্ডারটিকে ওষুধের টেবিলের কাছে ভীষণ ব্যস্ত দেখা যাচ্ছে। পেট মোটা লাল, নীল সাদা ওষুধের বড়ো বড়ো বোতল থেকে তাকে হরদম ওষুধ ঢেলে দিতে দেখা যাচ্ছে রোগীদের শিশিতে।

কম্পাউন্ডার। (একজনকে ওষুধের শিশি এগিয়ে দিয়ে অন্য একজন রোগীকে) তোমার!

ডাক্তার। (জনৈক দুঃস্থ রোগীকে পরীক্ষা করে) কাশতে লাগে, বুকে?

আট নম্বর রোগী। হ্যাঁ বাবু, বড্ড যন্তন্না!

ডাক্তার। যন্তন্না হয়! কী রকম যন্তন্না?

আট নম্বর রোগী। কী রকম যন্তন্না। যন্তনা—(প্রকাশ করতে না পেরে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকে)

ডাক্তার। জিভ্‌ দেখি, জিভ্‌!

[রোগী জিভ দেখাল।]

বড়ো করে বড়ো করে—

উঁ! (প্রেস্‌ক্রিপশন লিখতে লিখতে) রাত্রে ঘুম হয়?

[রোগী ঘাড় নেড়ে 'না' বলে।]

হয় না!

আট নম্বর রোগী। আজ্ঞে না।

ডাক্তার। (প্রেস্‌ক্রিপশনটা প্যাড থেকে ছিঁড়ে রোগীর হাতে দিয়ে) আচ্ছা ঐ ওষুধটাই আরো হপ্তাখানেক চলুক, বুঝলে?

আট নম্বর রোগী। আজ্ঞে আজ যে ওষুধটা পাল্‌টে দেবেন বলেছিলেন ডাক্তারবাবু?

ডাক্তার। পাল্‌টে দেব বলেছিলাম নাকি! আচ্ছা, এ হপ্তাটা ঐ চলুক তো!

আট নম্বর রোগী। কিন্তু জ্বর যে কিছুতেই বন্ধ হচ্ছে না!

ডাক্তার। হবে হবে, খেয়ে যাও ওষুধ। একটা কিছু হবার সময় যত তাড়াতাড়ি হয়, সারবার সময় কি আর তত তাড়াতাড়ি সারে? অস্থির হলে চলবে কী করে। (অন্য রোগীর প্রতি) হ্যাঁ তারপর—। (আট নম্বর রোগীর প্রতি) আচ্ছা যাও তুমি তা হলে।

আট নম্বর রোগী। জ্বরটা যে ডাক্তারবাবু কিছুতেই—। এট্টুখানি ভালো ওষুধ দিন ডাক্তারবাবু, আপনার পায়ে পড়ি।

ডাক্তার। আরে বাবা ভালো ওষুধ কি আমি গড়াব? যা ভালো, ঐ তো দিইছি যা দেবার।

আট নম্বর রোগী। এ ওষুধ তো এক মাস ধরেই খাচ্ছি; জ্বর তো কিছুতেই যায় না। আর এই পা ফোলাও তেমনি আছে।

ডাক্তার। ও জ্বর-টর সব ওতেই যাবে।

আট নম্বর রোগী। যাবে?

ডাক্তার। হ্যাঁ যাবে, যাও—আমার এখনও অনেক রোগী দেখতে হবে।

আট নম্বর রোগী। তবে যাই, তাই যাই।

[কিউ-এ গিয়ে দাঁড়ায়।]

ভদ্রলোক রোগী। (ডাক্তারের টেবিলের সামনে যিনি বসেছিলেন) সবই ম্যারেলিয়া কেস্, না ডাক্তারবাবু?

ডাক্তার। মোস্ট্‌লি তবে—এই দেখুন না, নট ওনলি ম্যালেরিয়া, শোথ হয়েছে লোকটার। প্রায় মাসাধিক কাল ভুগছে। এদিকে ওষুধ নেই, পত্তর নেই, বলুন তো কী দিয়ে কী চিকিৎসা করি।

ভদ্রলোক রোগী। তা জানান না কেন এ সব কথা ওপরে।

ডাক্তার। লিখে লিখে হয়রান মশাই, বলি যে ওষুধ-পত্তরই যদি সাপ্লাই করতে না পারো তো দরকার কী এই 'শ্যাম শো'-ব, বন্ধ করে দাও হাসপাতাল। হা, না—কোনো জবাব নেই তার। এখন বলুন, এ অবস্থায় আমরাই বা কতটুকুখানি কী করতে পারি। ভালো করে দেখে শুনে বিধি-ব্যবস্থা করতে দু-ঘন্টার জায়গায় নয় দশ

ঘন্টাই আমরা খাটলাম, দশখানার জায়গায় নয় দু'শখানা প্রেস্‌ক্রিপশন লিখলাম, কিন্তু ওষুধ যদি না পাওয়া যায় তো কী হবে তাতে করে বলুন!

ভদ্রলোক রোগী। তা তো বটেই।

ডাক্তার। আন্তরিকতা থাকতেও সে আন্তরিকতার কোনো মূল্য নেই। ট্রাজিডিই তো আমাদের এই। যাগ্‌গে সে সব কথা—(অন্য রোগীর প্রতি) কই দেখি তোমার কী?

[হঠাৎ হল-ঘরের ভেতর থেকে একটা রোগীর আর্তকণ্ঠ শোনা যায় আঁ-া-া নার্স একবার ত্রস্ত পায়ে রোগীর দিকে এগিয়ে যায়। তারপর রোগীকে একনজর দেখেই ছুটে যায় ডাক্তারের কাছে।]

নার্স। (ত্রস্তে) ডাঃ মুখার্জি

ডাক্তার। য়্যাঁ।

নার্স। পাঁচ নম্বর পেশেন্টের, 'হেমপ্‌টিসিস' হচ্ছে।

ডাক্তার। হেমপ্‌টিসিস্! কারণ?

নার্স। কারণ, আপনি একবার দেখবেন চলুন।

ডাক্তার। চলুন, চলুন।

[ডাক্তার ও নার্সের হল-ঘরে প্রস্থান। ওদিকে চলমান 'কিউ' সরে সরে যাচ্ছে। যে যার মতো ওষুধ-পত্তর নিয়ে চলে যাচ্ছে।]

(কয়েক মুহূর্ত রোগীর দিকে তাকিয়ে) চার্টটা দেখি।

[নার্স চার্ট এনে দেয়।]

(চার্ট দেখে) উঁ, টেম্পারেচারটা তো দেখছি বেশ 'রাইজ' করেছে আবার। সেই পাউডারটা দেয়া হয়েছিল?

নার্স। হ্যাঁ।

ডাক্তার। একটু বরফ আনতে বল জমাদারকে, চট করে।

[ডাক্তার নাড়ি পরীক্ষা করতে শুরু করে!]

নার্স। (বাইরের দিকে এগিয়ে গিয়ে) জমাদার!—জমাদার!

[জমাদারের প্রবেশ।]

থোড়াসে বরফ লাও।

জমাদার। লাতা হুঁ।

ডাক্তার। নেই একটা ওষুধ, নেই একটা কিছু; ধেত—

নার্স। (এগিয়ে এসে) ইনজেক্‌শন্ দেবেন নাকি একটা, গ্লুকোস!

ডাক্তার। গ্লুকোস ইনজেশন নেই।—নেই ইনজেকশন, নেই ওষুধ , আছে শুধু ঘর ভরতি রোগী— নন্‌সেন্স কারবার।

[হঠাৎ পাঁচ নম্বর রোগীর খিঁচুনি আরম্ভ হয়।
নার্স ত্রস্ত পায়ে এগিয়ে ঘরে রোগীর দিকে।]

নার্স। ডাক্তার মুখার্জি, পেশেন্ট—

ডাক্তার। আই য্যাম হেল্পলেস্। কিচ্ছু করবার নেই।

নার্স। (নাড়ি দেখে) কিন্তু পেশেন্ট যে সিঙ্ক্ করছে ডক্টর—

ডাক্তার। (চেঁচিয়ে) ও হো, আই নো রেবা হি উইল ডাই। হি, এণ্ড দি হোল লট অব দেম। দি ফিউচার ইজ বিয়িং মার্ডার্ড, ডেলিবারেটলি, মার্ডার্ড বাই থিভস্ অ্যাণ্ড বাংলার্স।
ডাক্তারের চিৎকার শুনে সমস্ত রোগী বিছানার উপর আধশোয়া হয়ে উঠে বসে আতঙ্কে

[আ আ আঁই শব্দ করতে থাকে।
কম্পাউণ্ডার একবার উঁকি মেরে দেখে যায়।]

(নিজেকে সামলে নিয়ে) শুয়ে পড়ো, শুয়ে পড়ো তোমরা সব। কিছু হয়নি তোমরা শোও, শুয়ে পড়ো। শোও, হ্যাঁ শোও।

[রোগীরা সব পূর্বের মতো আবার চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ে।
আর নার্স মৃত পাঁচ নম্বর রোগীর খাটিয়া ঘিরে একটা সাদা পর্দা টাঙিয়ে দিল।
আস্তে আস্তে বাইরের বারান্দায় ডাক্তারের পাশে এসে দাঁড়ায়।
রোগীদের কিউ পরিষ্কার হয়ে গেছে এতক্ষণে।
বাইরের ওষুধের টেবিলের কাছে শুধু কম্পাউণ্ডারকে কাজে ব্যস্ত দেখা যাচ্ছে।
স্টেচারসহ দুজন ধাঙ্গারের প্রবেশ।]

নার্স। (বাহকদ্বয়ের প্রতি) পাঁচ নম্বর।

জনৈক বাহক। জি।

[মৃতদেহটিকে স্ট্রেচারে তুলে নিয়ে বাহকদ্বয়ের প্রস্থান।]

ডাক্তার। (নিজ টেবিলে কাজে ব্যস্ত। হঠাৎ নার্সের দিকে মুখ তুলে করুণ হেসে) কী দেখে আশা করেছিলে যে লোকটা বাঁচবে, রেবা!

নার্স। আশা? না আশা আর কী!

[ডাক্তার কাজে মনোনিবেশ করে। প্রধানের প্রবেশ।]

(হঠাৎ নার্স দেখতে পায় যে দরজার কাছে আলু থালু বেশে বুড়ো মতো একটা লোক দাঁড়িয়ে আছে। দেখতে অনেকটা পাগলের মতো। বগলে নোংরা কতকগুলো কাগজ-পত্তর,

হাতে একটা হাঁড়ি। আর কাঁধে কতকগুলো নোংরা শতছিন্ন জামা কাপড়, ছেঁড়া কম্বল।) —কী, তোমার আবার কী?

ডাক্তার। (মুখ তুলে) কে!

নার্স। কী চাই তোমার?

প্রধান। আমার, আমার এট্টু ওষুধের দরকার মাঠান।

নার্স। ওষুধ।

[কাঁচুমাচু মুখ করে প্রধান মাথা নাড়ে।]

কিসের ওষুধ?

ডাক্তার। কী বলছে কী! কে দেখি!

নার্স। দেখুন তো!

ডাক্তার। (উঠে) কি হয়েছে কী! কী বলছ তুমি।

প্রধান। (এগিয়ে এসে) আমার এট্টু ওষুধ বাবা, (পায়ের দিকে লক্ষ করে) বড্ড ব্যথা।

ডাক্তার। বড্ড ব্যথা! কোথায়, দেখি! (হাতের আবর্জনাগুলোর দিকে ইঙ্গিত করে) ওগুলো কী?

প্রধান। এই, আছে।

ডাক্তার। এমনিই আছে?

প্রধান। (অপ্রতিভ হেসে) হ্যাঁ—এমনিই আছে।

ডাক্তার। ফেলে দাও না ওগুলো! কী হবে ও দিয়ে!

প্রধান। এগুলো ফেলে দিলে আর কী থাকবে! ওগুলো কি ফেলে দেওয়া যায়। এ সব হল—

ডাক্তার। অমূল্য রতন। ফেলে দেওয়া যায় না, না?

প্রধান। না (হাসে)

ডাক্তার। (নার্সকে) বুঝতে পেরেছেন, অসুখ!

নার্স। (মুখ টিপে হেসে) একটু একটু।

ডাক্তার। এ রকম যে কত হয়েছে—হবেই কিনা!

প্রধান। (না বুঝে) নিশ্চয় হবে, কেন হবে না (হঠাৎ ব্যথা অনুভব করে) উ-হু-হু-হু, বড্ড ব্যথা।

ডাক্তার। কোথায়, দেখি ব্যথা কোথায়!

প্রধান। (হাত তুলে) এই এখানে। (হাত দিয়ে দেখিয়ে) এইখানে ব্যথা।

ডাক্তার। (পা টিপে) কই ব্যথা কই! লাগে টিপলে?

প্রধান। না।

ডাক্তার। তবে, ব্যথা কোথায়?

প্রধান। (মৃদু হেসে) ঐতো, ঐখানেই ছিল।

ডাক্তার। ঐখানেই ছিল, আরে।

প্রধান। হ্যাঁ ঐখানেই ছিল। তারপর পালিয়ে গেল। এক দৌড়ে পালিয়ে গেল—

[নার্স মুখ টিপে হাসে।]

ডাক্তার। পালিয়ে গেল দৌড়ে?

[প্রধান হাত তুলে বিজয়ীর ভঙ্গিতে।]

কোথায় গেল?

প্রধান। (বলিষ্ঠ আকার ইঙ্গিতে) ঐ ব্যথা দৌড়ে পালিয়ে গেল; একেবারে সে সোঁ-ও-ও-ও-ও-ও নদ-নদী, খালখন্দ পেরিয়ে বনবাদাড় ভেঙে সে ব্যথা একেবারে হাওয়া গাড়ির মতো দৌড়ে চলে গেল হুই—

(হঠাৎ শরীরের কোনো অংশে ব্যথা লেগে চাপা গলায় আ-া-া শব্দ করে বুকে হাত চেপে আধবসা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। ডাক্তার নার্সের দিকে তাকায় আর প্রধান দাঁত মুখ খিঁচিয়ে ব্যথার অভিব্যক্তি জানাতে থাকে।)

ডাক্তার। (ক্ষীণ হেসে) আবার ব্যথা করছে তো?

প্রধান। (গম্ভীর ভাবে) হ্যাঁ, আবার ব্যথা করছে। এ ভয়ানক ব্যথা দারুণ যন্ত্রণা। এ ব্যথা এই আছে, এই নেই। কালবোশেখির মেঘের মতো আছে এ ব্যথা একেবারে হু হু করে উঠে আসে আমার সর্বাঙ্গ ছেয়ে—তারপর এই যে মাতন লাগে আরে ব্বাস রে বাপ্ সে একেবারে ঘর বাড়ি ভেঙে্ চুরে—

ডাক্তার। (ধমকের সুরে) থামো।

প্রধান। (সবিনয়ে) থামতে বলছেন!

ডাক্তার। হ্যাঁ থামতে বলছি—ও ব্যথা ট্যথা তোমার সব বাজে কথা, মিথ্যে।

প্রধান। (ক্ষোভের সুরে) মিথ্যে।

ডাক্তার। হ্যাঁ মিথ্যে। একদম মিথ্যে।—ভুলে যাও তুমি তোমার ব্যথার কথা। তোমার ব্যথা নেই।

প্রধান। (বোকার মতো) ব্যথা নেই?

ডাক্তার। না ব্যথা নেই, কিছু নেই! ভুলে যাও তুমি তোমার ব্যথার কথা।

প্রধান। (হঠাৎ নোংরা জামা-কাপড় আর আবর্জনাগুলো জোরে আঁকড়ে ধরে সোজা হয়ে

দাঁড়ায়) তাই ভালো। ভুলে যাও। ভুলে যাও ব্যথার কথা! ভুলে যাও তুমি তোমার ব্যথার কথা। ভুলে যাও।

[নিজের আবেগে কথা বলতে বলতে প্রধানের প্রস্থান।
ডাক্তার ও নার্স বিস্মিতের ভঙ্গিতে চেয়ে থাকে প্রধানের দিকে।]

(পটক্ষেপ)

৪৭.১২ সারাংশ ঃ (নবান্ন ঃ তৃতীয় অঙ্ক)

কুঞ্জ আর রাধিকা এই লঙ্গারখানায় এসে জানতে পারে রাস্তার থেকে পুরুষ মানুষদের ধরে নিয়ে যাচ্ছে যুদ্ধে। 'কেউ' বলছে ধরে ধরে নাকি সব যুদ্ধে নিয়ে যাচ্ছে। [২য় ভিখিরি] আর সোমত্থ মেয়েদের ধরে নিয়ে যাচ্ছে অন্যত্র, ...নিবি তো সব একসঙ্গো ধরে নিয়ে যা না বাপু, য়্যাঁ, সেই না কথা! তা না কেউ পড়ে থাকল, কেউ গেল, এ কীরকম ধারা বেআক্কেলে কাণ্ড! (চেঁচিয়ে) মেয়েডারে নিয়ে গেলি অথচ মা বিটিরে ফেলে রেখে গেলি রাস্তায়, এটা প্রাণে এট্টা কথা বলল না!' [১ম ভিখারিনী] সব মিলিয়ে মানুষের জীবন হয়ে পড়েছে মূল্যহীন। তাই কুঞ্জ বলে, 'আর তোমার আমার জীবন— কী দাম আছে এ জীবনের? কিছু না। এমনিই বলে তাই উজোড় হয়ে গেল, য়্যাঁ।' [৩য় অঙ্ক ১ম দৃশ্য] এখান থেকে তারা আবার এও জানতে পারে,—সমথ চাষীলোক যারা তাদের সব দেশ ঘরে পাঠিয়ে দিচ্ছে।' কেন না. 'কেউ বলে ধান নাকি এবার এত হয়েছে যে কাটবার পর্যন্ত লোক পাওয়া যাচ্ছে না। তাই চাষী লোকদের সব গেরামে পাঠিয়ে দিচ্ছে।' [৩য় ভিখিরি]

কুঞ্জ আর রাধিকার সমস্ত অন্তরটা আমিনপুরের জন্য কেঁদে ওঠে। মুহূর্তের মধ্যে আমিনপুরে ফিরে যাওয়ার জন্য প্রাণ আনচান করে ওঠে। ত্বরিতে কুঞ্জ রাধিকাকে প্রস্তাব দেয়, 'চল বউ আমরা গাঁয়ে ফিরে যাই। এ পোড়া মাটির দেশে আর থাকব না। চল ফিরে যাই।' [৩য় অঙ্ক, ১ম দৃশ্য] রাধিকা এই প্রস্তাবে রাজি হয়। চল না, আমার কি অসাধ । গাঁয়ে ফিরে যাব, সে তো আমার সৌভাগ্যির কথা। কিন্তু কোথায় যাব?—সেখানকার মাটিও তো পুড়ে গেছে আমার ভাগ্যে—যদি আমার মাখন থাকত—' [ঐ]

বন্যা, হাহাকার, দুর্ভিক্ষ কবলিত অসহায় মানুষের বুকে গভীর দুঃখ আর হতাশা। কিন্তু 'নবান্নে' শুধু দুঃখ আর হতাশার কাহিনী নেই। তা যদি থাকত তাহলে এই নাটক নাট্য আন্দোলনের হাতিয়ার হতে পারত না, পারত না গণনাটকের মর্যাদা অর্জন করতে। 'নবান্নে' দুঃখ জর্জরিত একদল মানুষের ক্রন্দন আছে, দুর্ভিক্ষ কবলিত অসহায় মানুষের হতাশাচ্ছন্ন হাহাকার আছে, কিন্তু সেই সঙ্গে প্রচণ্ড আশাবাদের ইঙ্গিত, 'ও সব হবে বউ, সব হবে। দুঃখ করিস নে!' 'নবান্ন' নাটকের মূল্য এখানেই। 'সব হবে' এই আশাবাদই 'নবান্ন' নাটকের আসল ঐশ্বর্য। দুঃখের অমানিশা কাটবে প্রভাতের অরুণালোয় জীবন আবার উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে এই আশা ও আলো কুঞ্জর চোখে ঝলমল করে ওঠে। 'কুঞ্জর হাত ধরে রাধিকা এগিয়ে চলে।' [ঐ] এ হল প্রথম দৃশ্যের বিষয়বস্তু।

তৃতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্য একটি চিকিৎসা কেন্দ্র। দরদালানের মত একটি লম্বা ঘরের দু'পাশের সারবন্দী খাটিয়ায় রোগী ভর্তি। তাদের কেউ কেউ তীব্র আর্তনাদ করছে। বারান্দায় চেয়ার টেবিল পেতে ডাক্তারবাবু বহির্বিভাগের রোগী দেখছেন। তিনি রোগী দেখে প্রেস্‌ক্রিপশন লিখেছেন। কম্পাউণ্ডার লাল নীল বোতল থেকে ওষুধ রোগীদের শিশিতে ঢেলে দেন।

অপুষ্টিজনিত কারণে নানা ধরনের রোগ। চিকিৎসা কেন্দ্রে উপযুক্ত ওষুধ নেই—রুগীর অভিযোনও অন্তহীন। ডাক্তারবাবু নিষ্ঠাভরে রোগী দেখেও তাদের সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করতে না পারায় অসহায় বোধ করেন। অনুভব করেন, "আন্তরিকতার কোন মূল্য নেই"। বলেন, 'আই অ্যাম হেল্পলেস্'।

এমনি সময় আকস্মিক দুর্যোগে মানসিক ভারসাম্যহীন অনাহারক্লিষ্ট প্রধান সমাদ্দার নোংরা জামা কাপড় ও স্তূপাকৃতি আবর্জনা নিয়ে ঢুকে পড়ে। সে যে ব্যথার কথা বলে তার সঙ্গে সেই কালবোশেখির যোগ দেখা যায়। সবমিলিয়ে অঙ্কটি যেন হাতাশা ও আশার দোলায় আন্দোলিত জীবনের একটি বাস্তব ছবি।

৪৭.১৩ মূলপাঠ ৪ — নবান্ন ঃ চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

শহর থেকে ফিরে ভাঙা ঘরখানা জুড়েতেড়ে নিরঞ্জন আবার বাসোপযোগী করে নিয়েছে। পর্দা সরে যেতেই প্রায় কুড়ি-পঁচিশ জন গেরস্থ চাষীকে প্রধান সমাদ্দারের বাড়ির স্বল্প পরিসর উঠোনটার মাঝখানে পারস্পরিক আলোচনায় মত্ত দেখা যাচ্ছে। জনতার ভেতর তিনটে গ্রুপ। প্রত্যেক গ্রুপে তিন চারজন করে লোক বিচ্ছিন্নভাবে দাঁড়িয়ে কথা বলতে শোনা যাচ্ছে। প্রত্যেকটা গ্রুপের আলোচ্য বিষয়বস্তু ও বিশ্লেষণের নিজস্ব একটা ঢং আছে। বাকি লোক সব উঠোনে বসে এ ওর সঙ্গে কথাবার্তা বলছে। তবে বসে আছে যারা তাদের আলোচনাটা তেমন দৃষ্টি আকর্ষণ করছে না। দ্রষ্টব্য হয়ে উঠেছে ঐ তিনটে গ্রুপ। তবে বৈশিষ্ট্য এখানেও যে যখন যে গ্রুপটা কথা বলছে কখনও কখনও বাকি দুটো গ্রুপের আলোচনায় ভাটা পড়ছে অভিনয়ের খাতিরে। মঞ্চের ডানদিকে দাঁড়িয়ে প্রথম গ্রুপ ফকির, সুজন ও ভজনের মধ্যে পর্দা সরে যেতেই আলোচনা শুরু হয়। মঞ্চের মাঝখানে ও বাঁদিকে দাঁড়িয়ে আর দুটো গ্রুপ তখন নিচু গলায়, আকারে ইঙ্গিতে আলোচনা চালাতে থাকে। দাওয়ার ওপর দয়াল মণ্ডল, নিরঞ্জন প্রভৃতি বসে, আলাপ আলোচনা করছিল এতক্ষণ। সখীচরণ কথা শেষ করতেই বরকত সভা আহ্বান করে।

ফকির। (সুজনের প্রতি) বাপের দেনা ঘাড়ে নিয়ে জগতে জন্মেছি আবার মরবার সময় নিজের দেনাটা যথারীতি ছেলের কাঁধে চাপিয়ে দিয়ে চলে যাব, এই তো হয়ে আসছে দেখি চিরটাকাল., জন্ম-জন্মান্তর। তা এ আর এটা কথা কী এমন বিশেষ।

ভজন। না এ যা বলছ তা খাঁটি কথাই বলেছ।

সুজন। সেই কি আর এটাটা কথা হল।—চলে এয়েছে বলেই যে জিনিসটারে চালিয়ে নেবে, ভালমন্দ বিচার পর্যন্ত করবে না, কী রকম ধারা কথা।

ফকির। উপায় কী বল!

সুজন। উপায়—করে নিতে হবে উপায়।

ফকির। তা য়্যাদ্দিন হয়নি কেন—এ তো আর তোমার আজকের সমস্যা না।

সুজন। য়্যাদ্দিন হয়নি কেন—কী রকম যে তুমি কথা বল মামু তা বুঝে উঠতে পরিনে। আরে সমস্যা যদি মেনেই নিতে তো উপায় খুঁজে বের করবার দরকারটা পড়ে কিসে! সব্বার আগে ওটা যে এট্টা সমস্যা, এই বুঝটা তো অন্তত থাকা দরকার, না কী?

ফকির। না তা তো—

সুজন। তো তবে।

(সুজনের কথার সঙ্গে সঙ্গে প্রধান গ্রুপের আলোচনাটা নিস্তেজ হয়ে আসতেই মঞ্চের মাঝখানটায় দ্বিতীয় গ্রুপটা মুখর হয়ে ওঠে। প্রথম গ্রুপের আলোচনাটা তখন বাহ্যত দু-একটা কথাবার্তা কানাঘুসো ও ভাবে-ভঙ্গিতেই ব্যক্ত হতে থাকে। দ্বিতীয় গ্রুপের রহিম বরকত ও গোলাম নবীর মধ্যে আলোচনা আরম্ভ হয়। বরকত তার কচি মেয়েটাকে সাজিয়ে কাঁধে করে নিয়ে এনেছে।)

রহিম। কিন্তু তা যেন না হয় দিলাম, কিন্তু পীরের দরগায় খাসি! সেটা তো দিতেই হয়।

বরকত। কেন!

রহিম। মানত রয়েছে যে।

বরকত। তোর দেখছি শতেক দেনা!

গোলাম নবী। মানত আছে পরে দিও খাসি। তাতে কোনো দোষ নেই। আসলে দেওয়া নিয়ে হচ্ছে কথা। দুদিন পেছিয়ে দিলে আর তুমি জাহান্নামে যাবে?

রহিম। কিন্তু মওলানা যে আমারে তা হলে একেবারে সেরে ফেলে দেবে'খন! এই বলে তাই—

বরকত। বললেই হল আর কী মওলানা। সুবিধে-অসুবিধে নেই মানুষের! ও তুমি দেবার হয় পরে দিও। ...খোদাতালার চোখ তোমার গে ঐ মওলানার কটা চোখের মত ছোটো না. একথা মনে করে রেখো।

বরকতের কথার সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় গ্রুপের আলোচনায় ভাটা নামে। আরম্ভ হয় তখন তৃতীয় গ্রুপের কথা বার্তা। দিগম্বর, সখীচরণ প্রমুখ চারজন লোক আলোচনা আরম্ভ করে।

দিগম্বর। আরে পাওনাদার তো আমরা সকলেই। তার জন্যে আর কী, হ্যাঃ! জীবন-ভর খালি দেনাই করে গেলাম, পেলাম না আর কোনো কিছু কারো ঠেঙে।

সখীচরণ। ফসলডা যদি একবার মরে-পিটে তুলতে পারি তো দেখি একবার।

দিগম্বর। এখন বলেছ বটে! কিন্তু পেট ভরবার সঙ্গো সঙ্গোই দেখবে যে আবার দয়াবান হয়ে উঠেছ। তখন তার শত্রু-মিত্র জ্ঞান থাকবে না—এই রোগেই তো মরলে চাষী, —দিল করে রেখেছ সব রাজার নাগাল অথচ সঙ্গতি নেই এক আধলার।

সখীচরণ। না এবার আর—

[দাওয়ার উপর দয়াল মণ্ডল, নিরঞ্জন প্রভৃতি আলাপ আলোচনা করছিল এতক্ষণ। সখীচরণ কথা শেষ-করতেই বরকত সভা আহ্বান করে।]

বরকত। তা হলে এইবার আলোচনা আরম্ভ করা যেতে পারে, কী বল মণ্ডল! এসে তো গেছে সকলেই একরকম।

দয়াল। হ্যাঁ আর দেরি কী?

নিরঞ্জন। না, আর দেরি কী, এইবার শুরু করে দেওয়া যাক।

বরকত। হ্যাঁ শুরু করে দাও।

দিগম্বর। আর সকলেই তো একরকম উপস্থিত হয়ে গেছে, এইবার—

সখীচরণ। আরম্ভ কর।

[নেপথ্যে 'বল হরি হরিবোল' ধ্বনি।]

বরকত। দয়ালদা শুরু কর।

[নিরঞ্জনের কানে কানে যেন কী কথা বলল।]

নিরঞ্জন। হ্যাঁ। (মাথা নেড়ে হাসতে লাগল)

দয়াল। আমিই করব, তার চাইতে বরং—

নিরঞ্জন। না তুমিই কর, শুরু করে দাও তারপর—

বরকত। হ্যাঁ আরম্ভডা তো করে দাও তারপর সকলে মিলে সেডারে

দয়াল। (একটু হেসে) আচ্ছা, আচ্ছা!

[সহসা একটা ঋজুতা ও কাঠিণ্যের ছাপ ফুটে উঠে দয়ালের মুখে।]

দয়াল। (মাটিতে আঙুল দিয়ে দাগ কাটতে কাটতে তার হঠাৎ মুখ তুলে তুলে) মানে কথা হচ্ছে যে, আমরা, যারা আজ এখানে উপস্থিত হইছি, তারা বেশ ভালো করেই সমস্যার কথা জানি। কী যে সমস্যা, না সে সমস্যা খুবই গুরুতর সমস্যা জীবন-মরণ সমস্যা—ফসল কাটা, ঝাড়া, তোলা তারপর আবার তোমার সেই ফসল রক্ষে করার সমস্যা। এখন প্রকৃত অবস্থা যা, তাতে করে সত্যি কথা বলতে গেলে, এই যে আমরা আজ এখানে দশজন বসে ভেবে-চিন্তে এটা উপায় বের করব বলে স্থির করেছি, এই সময়ডাও পর্যন্ত আমাদের নষ্ট করা উচিত নয়।

নিরঞ্জন। ঠিক, অতি ঠিক।

[নেপথ্যে 'বল হরি হরিবোল' ধ্বনি।]

দয়াল। আমি বলছিনে যে এ আলাপ-আলোচনার প্রয়োজন নেই। আছে, খুবই আছে। সে কথা না, তবে অবস্থার গুরুত্বডা যাতে করে আমাদের কারো কাছে এক মুহূর্তের জন্যেও কম মনে না হয়, সেই কারণেই ঐ কথাডা উত্থাপন করলাম। সাদা কথায় বলতে গেলে ব্যাপারডা দাঁড়ায় এই যে, এখনই এই মুহূর্তে আমরা যদি ফসল রক্ষে করার একটা ব্যবস্থা না করে উঠতে পারি, তা হলে মিত্যু ছাড়া আমাদের কোনো গত্যন্তর থাকবে না। সব ঘরে পড়ে মরতে হবে আমাদের। কেউ ঠেকাতে পারবে না।

[সকলে নড়ে চড়ে বসে ও পরস্পররের কানে কানে যেন কী সব বলা কওয়া করে। একটা কলগুঞ্জন ওঠে।]

সংক্ষেপে সমস্যার কথা আমি বললাম, এইবার সকলে মিলে তোমরা কওয়া বলা কর, কী হলে কী হয়, কোন পথে এর এট্টা মীমাংসা হয়—বরকত বল।

বরকত। (নড়ে চড়ে) বলব বা কী আমি।

দয়াল। (কল্‌কে দিয়ে) আহা এ সম্বন্ধে তো যা-হোক কিছু ভেবেছ, তো সেই কথাই বল। সমস্যা সকলের—(তামাক টানে)

[নেপথে— 'বল হরি হরিবোল' ধ্বনি।]

বরকত। না সে তো ঠিক কথা।—

নিরঞ্জন। তুমি যা ভেবেছ তাই বল।

[নেপথে খুব জোরে— 'বল হরি হরিবোল' ধ্বনি।]

নিরঞ্জন। আরে ও মারা গেল কেডা।

[নেপথ্য থেকে উত্তর আসে— 'ত্রিলোচন বিশ্বাস'।]

দিগম্বর। ত্রিলোচন মানে যে আমাদের নারানের বাপ। য্যাঁ আরে সে দিনও তো কত গল্প করলাম রাস্তায় দাঁড়িয়ে ত্রিলোচনের সঙ্গে। কী আশ্চর্য।

সখীচরণ। হইছিল কী?

নিরঞ্জন। আবার হতে হয় নাকি কিছু।

বরকত। মরা তো হয়েছে হাতের পাঁচ। গেলেই হল।

দয়াল। য্যাঁ-া-া-া।—হয়েছেই এই অরাজক অবস্থা—তা সে যে গেল তার দায়িত্ব তো ফুরিয়েই গেল এখন থাকল যারা তাদের নিয়েই হচ্ছে কথা। ধান যে ওদিক সব পেকে ঝড়ে পড়ে গেল, সেই অপমিত্যু ঠেকাবে কী দিয়ে এখন সেই কথাই ভাবো।

ফকির। তারপর বরকত বল কী বলছিলে।

বরকত। কীই বা বলব।

দিগম্বর। যা ভেবেছ, তাই বলবে। ঠিকই যে হবে এমন তো কোনো কথা নেই। তবে দেখবে যে এই আলাপ-আলোচনা করতে করতেই পথ এট্টা খুঁজে পাওয়া যাবে, এই, বল, বল না।

সখীচরণ। হ্যাঁ পাঁচজনে মিলে আলোচনা এর ভেতর আবার এট্টা কথা কী!

বরকত। মানে কথা হচ্ছে যে ভাবিনি যে এ বিষয়ে কিছুই একেবারে তা নয়; ভেবেছি। তবে বিষয়ডা তো সহজ নয় তেমন, মুশকিল আসানের পথ এখনও ভেবে বার করতে পারিনি। তারপর শুধু শুধু ভেবেই বা কী করব বল? না পাওয়া যায় এট্টা লোক যে বাতে সঙ্গো এট্টু জোগান দেবে। খাওয়া পরা বাদে দু-তিন টাকা রোজ দিয়েও লোক মেলে না। এখন এত ফসল কেটে তুলি কী করে, বলদিনি। অথচ এদিকে আবার এমনিই অবস্থা— মাতব্বর অবশ্য বলেছে সে-কথা যে, দুইচার দিনের ভেতর এই ফসল কাটা হল তো হল, আর নয় তো বিলকূল পয়মাল হয়ে গেল। এই তো অবস্থা। ভাবিনি বলছ, ভেবেছি কিন্তু ঐ পর্যন্তই। বিশখানা কাস্তের জায়গায় আমার এই এতটুকুখানি একফালি কাস্তে এ কতডা কী করতে পারে বল তো? তো কী বলব বল এ কথার।

দয়াল। এ তো তোমার গিয়ে সেই সমস্যার কথাই দাঁড়াল।

বরকত। হ্যাঁ, তা তাই তো হল। তা ছাড়া আর কী। ভেবে চিন্তে যখন খেই-ই পাচ্ছি নে কিছুতেই এর তখন—দুই চোখ এক করতে পারিনে রাতে মণ্ডল, খালি ভাবনা আর চিন্তে, ভোর বেলা উঠে দেখি মুখখানা একেবারে পচে তেতো বিষ হয়ে আছে। হাতে পায়ে বল পাই নে—

দিগম্বর। আর এই অসুখ বিসুখ; একেবারে জেরবার করে ফেল্লে মনে প্রাণে। সাওস, উদ্যম, যে না এটা করতেই হবে আমার তা সে মরি আর বাঁচি এ আসবে কোত্থেকে। মানুষ কি আর মানুষ আছে? না!

দয়াল। বুঝলাম, সব বুঝলাম; কিন্তু এই মানুষই তো আবার বাঁচতে চাইবে দিগম্বর। সহায় নেই সঙ্গাতি নেই, মন্বন্তরে একেবারে জ্বলে পুড়ে গেছে সব ঘর-সংসার, তবুও তো দেখ আবার এই সভা হয়। তাও আবার কোথায়? নিরঞ্জনের বাড়ির ওপর, উঁ নিরঞ্জনই হল গিয়ে তার জোগাড়ে। তা এ তুমি ঠেকাবে কেমন করে। মানুষের ভেতরকার এই যে এট্টা ই'য়ে এ তুমি রোধ কর কী করে। মানুষ তো বাঁচতে চাইবেই।

[ক্ষণকালের জন্য সকলেই চুপচাপ। একটু পরে নিরঞ্জন গলাখাঁকারি দিয়ে আকারে ইঙ্গিতে যেমন একটা আবহাওয়া সৃষ্টি করে হাবভাবে মনে হয় যেন সে কিছু বলতে চাইছে।]

বরকত। নিরঞ্জন কিছু বলবে নাকি? তা বল না, জোরেই বল।

দয়াল। কী নিরঞ্জন কিছু বলতে চাও? তো বল না বল;

নিরঞ্জন। না এই বলছিলাম কী!

দয়াল। উঁ।

নিরঞ্জন। এই যে বরকত চাচা আর দিগম্বর যা বলছিল, অসুখ বিসুখ আর দুঃখ-কষ্টের কথা, তা সে কথা বলতে গেলে ওতো আমাদের জীবনের একরকম চিরসাথী হয়ে গেছে। এমন না, দু'দণ্ড বসে ঐ নিয়ে পাঁচজনে আলাপ-আলোচনা করলে তার উপশম হবে'খন।

দয়াল। ঠিক।

নিরঞ্জন। তা এখন যদি কিছু করতে হয় তো এই অবস্থার ভেতরে থেকেই যা হয় এট্টা কিছু করতে হবে।

দিগম্বর। তা তো বুঝেছে সকলেই। কিন্তু সেই 'যা হয় এটা কিছু' করা নিয়েই তো মুশকিল বেঁধেছে। কী সেডা?

বরকত। আদত কথাই তো তাই।—আচ্ছা—া-া—

দয়াল। বল কী বলছিলে।

বরকত। বলছিলাম বলি জমিদার বাবুরা, জমিদার বাবুরা যদি এই গে তোমার গত ক'সনের খাজনা—

দয়াল। মুকুব করে—

বরকত। হ্যাঁ।

দয়াল। বেশ তো আবেদন-নিবেদন করতে থাকো না কেন, বারণ করছে কে! খাজনা-পত্তর চাই, মুকুব চাই, বীজধান চাই, কৃষিঋণ চাই, এ সব তো আছেই। তবে আমার কথা হচ্ছে যে; প্রথম থেকেই একেবারে ওপরওয়ালাদের ওপর নির্ভর করে না থেকে নিজেরা কতটুকুখানি কী করতে পার তাই ভাবো—যা দিয়ে যা হবে।

দিগম্বর। হ্যাঁ প্রথম থেকেই একেবারে চাতকপাখির নাগাল হা-পিত্যেশে ওপরের দিকে চেয়ে থাকা, ওতে কোনো কাজ হবে না।

সখীচরণ। হ্যাঁ।

মানিক। না ও মিথ্যে। অনাহক—

দয়াল। আচ্ছা এক কাজ করলে কেমন হয়।

[উৎকর্ণ হয়ে ওঠে সকলে।]

বিষয়ডা অবশ্য ভালো করে বিবেচনা করে দেখতে হবে সকলে মিলে।

ধ্বনি ওঠে—কী বিষয়, কী বলতে চাও তুমি' ইত্যাদি।

বলছি বলি সকলে মিলে গাঁতায় খাটলে কেমন হয়।

বরকত। গাঁতায় খাটলে!

দয়াল। হ্যাঁ। ধর এই আমিনপুর গ্রামের কথাই বলি। কমপক্ষে চল্লিশ পঞ্চাশ ঘর গেরস্তের এখানে বাস। এখন কাজের সময় আমরা যে ঠিক এই পঞ্চাশ ষাট ঘর গেরস্তেরই সাহায্য পাব, এমন কথা বলিনে। কারণ অসুখ আছে, বিসুখ আছে, রোগ, শোক ইত্যাদি আরও পাঁচটা দৈব দুর্ঘটনা আছে, এ আছে। তবু এখন কথা হচ্ছে যে, এই পঞ্চাশ জনার অর্ধেক অতিকম পঁচিশ ঘর গেরস্তের সাহায্যও যদি আমরা পাই এবং প্রত্যেকের জমিতে আমরা যদি সকলে মিলে গাঁতায় খাটব বলে পিতিজ্ঞে করি, তা হলে আমার খুব বিশ্বেস যে, একদানা ফসলও কারো জমির নষ্ট হতে পারবে না। দশ হাতে অনায়াসে এ ফসল আমরা গোলায় তুলে ফেলতে পারব।

[প্রত্যেকেই প্রত্যেকের দিকে তাকিয়ে হাবভাবে আকারে ইঙ্গিতে কথাবার্তায় সমর্থন করে দয়াল মণ্ডলের যুক্তি।]

দিগম্বর। (মাথা নেড়ে) হ্যাঁ তা হতে পারে।

সখীচরণ। না এ তো যথার্থ কথাই।

সুজন। তা মনে প্রাণে গাঁতায় খাটলে পরে ও একরকম করে ফসল—

গোলাম নবী। না এ লেজ্য কথা—

ফকির। ফসল না হয় তোলা গেল কিন্তু—

দয়াল। সেইটেই কি কম কথা হল বলে তুমি মনে কর মিঞা?

ফকির। না সে তো ঠিকই, তবে সমস্যা তো তোমার সেখানেই শেষ হল না। রক্ষে করবে কী করে তুমি এ ফসল। জমিদার আছে, মহাজন আছে, পাইকার আছে—

দয়াল। আসছে, পরে আসছে সে সব সমস্যার কথা।

সুজন। হ্যাঁ খাজনা সব বকেয়া পড়ে আছে জমিদারের ঘরে, তারপর মহাজনও পাবে থোবে অনেক কিছু। এখন ফসলটা উঠলেই পরেই তো সব চারদিক থেকে একেবারে শকুনের নাগাল উড়ে পড়বে'খন দ্যাও দ্যাও করে।

দয়াল। তা সে রুখতে হবে যে করেই হোক। এখন যারে নিয়ে খাজনা, সে তো আগে বাঁচবে না কী।

সুজন। তা সে কথা বোঝে কে!

দয়াল। বোঝে কে, বোঝাতে হবে। গায়ে জল দে বসে থাকলে হয়।

বরকত। হ্যাঁ সে অবস্থা অনুসারে ব্যবস্থা করে চলতে হবে। এখন আগে থাকতেই মীমাংসা কর কী করে তুমি সব কিছুর?

দয়াল। এই। আসল কথা হল ফসল, সেটা যাতে নষ্ট না হয় তার তো একটা ব্যবস্থা করতে হবে সব্বার আগে।

সুজন। না সে কথা তো একশ বার।

দয়াল। তো তবে! এক এক করে এসো।

দিগম্বর। না সে গাঁতায় খাটলে পরে—তা কী বল তোমরা সব? স্বীকার আছ তো খাটতে গাঁতায়? সাদা মনে বলবে কিন্তুক।

[সকলে সমস্বরে 'নিশ্চয় খাটব', 'খাটব গাঁতায়' ধ্বনি করে।]

বরকত। হ্যাঁ ফসলটা তো আগে উঠে যাক ঘরে। তারপর মাঝপথে যে সব বাধাবিপত্তি আসবে, তা সে তুমি বলতে পার না এখুনি কী করব। তবে আমার মনে হয় যে একসঙ্গো মিলে মিশে চললে পরে—

দয়াল। (সঙ্গো সঙ্গো) মুশকিল আসানের পথ এট্টা খুঁজে পাওয়া যাবে আশা করা যায়।

দিগম্বর। আসল কথা হচ্ছে এখন ফসল—(আনন্দে) তা সে যা হোক ধান যদি একবার তুলতে পারি সব, তো আমি আমার জমির অর্ধেক ফসল গেরামের দুঃখী গেরস্থ ভাইদের জন্যে দিয়ে দেব।

বুধে। (বোকা গোছের একজন চাষী) আমি সব দিয়ে দেব। চার বিঘে জমির এট্টা ফসলও আমি নেব না।

দয়াল। (হেসে) সব দিয়ে দিলে তুই কী খেয়ে বাঁচবি রে আহাম্মক। দুস!

[সকলে হেসে ওঠে।]

ফকির। কার ফসল কেডা দেয়!—আরে জমি সে তো বেচে বসে আছে ও আগে থাকতেই; তার ধান দেবে কী রকম! ধান কি ওর! তারপর—

গোলাম নবী। এডা লেজ্য কথা বলেছে।

বরকত। হ্যাঁ তা আছে এ সব সমস্যা। আচ্ছা তা হলে এখন এই পর্যন্তই থাকল, তারপর সন্ধ্যের পর আবার দয়াল মণ্ডলের ওখানে বসে—যেও কিন্তু তোমরা সব সময়মতো।

দয়াল। (উঠে দাঁড়িয়ে) হ্যাঁ সে সমস্যা এখনও আছে পরেও থাকবে, তবে বর্তমানে আমার কথা হচ্ছে কী যে কাল সকালবেলা থেকেই ধান কাটা শুবু করে দিতে হবে আর কী। আর বিলম্ব করলে চলবে না।

[সকলে গামছা ও দোলাই ঝেড়ে ঝুড়ে কাঁধের ওপর ফেলে উঠে দাঁড়ায়। তারপর আস্তে আস্তে দু-একজন করে ডানদিক ও বাঁদিক দিয়ে প্রস্থান করে।]

দয়াল। (উঠোনে নেমে বরকতের মেয়েকে লক্ষ্য করে সহাস্য মুখে এগিয়ে গিয়ে) ওডা কেডা রে। কেডা ও য়্যাঁ।

নিরঞ্জন। (হাসিমুখে) বরকত চাচার মেয়ে। বড্ড নজ্জা।

দয়াল। তাই নাকি! (এগিয়ে গিয়ে) হ্যাঁ রে, লজ্জা নাকি তোর খুব। (বরকতের মেয়ের মাথায় হাত দিয়ে) তা লজ্জা হবে না। আমার যে ওর সঙ্গে নিকে হয়েছে সেদিন, না রে!

বরকতের মেয়ে। যা! (মুখ লুকোয় বরকতের কোলের মধ্যে)

দয়াল। আচ্ছা দ্যাখ তো আমারে তোর পছন্দ হয় কি না, এই। আমারে বিয়ে করবি? (মেয়েটা চট্ করে দয়াল মণ্ডলের দাড়ি মুঠো করে ধরে। উ-হু-হু-হু, ছেড়ে দে ছেড়ে দে। (ছাড়িয়ে নিয়ে। কী ডাকাতে বউ-রে বাব্বা, কী ডাকাতে বউ।

[সকলে হাসে, মেয়েটিও খিল খিল করে হাসে।]

[ফকির, নিরঞ্জন ও সকন্যা বরকত বাদে সকলের প্রস্থান।]

ফকির। হুঁঃ, গাঁতায় খাটলে।—গাঁতায় খাটলেই যেন সব সমস্যার সমাধান হয়ে গেল। গাঁতায় খাটলে!—ধরো যে সমস্ত জমি কবালা হয়ে গেছে, কী করে সেইসব জমিতে গাঁতায় খেটে! আর তারপর ধান বন্ধকি রেখে দাদন খেয়েছে যারা, তাদের জমিতেই বা গাঁতায় খেটে কী হবে আমাদের। ধান তো যাবে জোতদার মহাজনের ঘরে—তারপর।

বরকত। আ-হা তা আছে সে সমস্যার কথা। এ তো আর কেউ অস্বীকার—

ফকির। তো তবে, ফলডা কী হবে এতে করে।

বরকত। তা বলি চেষ্টাডা' ত করতে হবে, না কী, হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকব সব!

ফকির। ভালো, দ্যাখো—কর চেষ্টা।

[ফকিরের প্রস্থান।]

বরকত। ফ'করেডা যেন একেবারে কী রকম ধারা মানুষ!

নিরঞ্জন। (দাওয়ার ওপর বসে তামাক সাজতে সাজতে) তা দাঁড়িয়ে রইলে কেন বরকত চাচা, বস; উঠে বস।

বরকত। হ্যাঁ বসি, বসি। (উঠে বসে)

নিরঞ্জন। (কলকেয় ফুঁ দিতে দিতে) মানুষ, এ মানুষের হুঁ। কখনও কি ভাবতে পেয়েছি বরকত চাচা যে আবার ভিটেয় ফিরে আসব, আবার ঘর বাঁধব, নতুন করে আবার—

[বরকতের দিকে চেয়ে থাকে।]

বরকত। (তামাক খেতে খেতে) এই তো ইতিহাস। উৎরোই আর চড়াই, চড়াই আর উৎরোই।

নিরঞ্জন। (ঘাড় নাড়ে) ঠিক ঠিক!—এক এক সময় মনে হয় বরকত চাচা, যে এ নৌকো বুঝি আর চললে না, থাকল আটকে পড়ে চোরাবালিতে ঐ মাঝ ডাঙায়। কিন্তু তারপরই দেখি যে না, আবার চলতে আরম্ভ করেছে নৌকো তর্ তর্ করে, টল টল করছে জল দরিয়ার। কোথায় চোরাবালি! অদ্ভুত, অদ্ভুত!

বরকত। সংসারের ধারাই তো এই। (দুজনে চুপ করে বসে থাকে কিছুক্ষণ) রাত হয়ে গেল নিরঞ্জন, আমি তা হলে উঠি এখন। (উঠে পড়ে)

নিরঞ্জন। আচ্ছা যাচ্ছ তো তা হলে মণ্ডলের বাড়ি?

বরকত। হ্যাঁ, তুমিও যেয়ো যেন।

[গমনোদ্যত।]

নিরঞ্জন। (পিছু পিছু এগিয়ে গিয়ে) হ্যাঁ নিশ্চয় যাব।

[বরকতের
প্রস্থান।]

(নিরঞ্জন ফিরে গিয়ে দাওয়ার ওপর চিৎপাত হয়ে শুয়ে পড়ে। নিরঞ্জনের বউ বিনোদিনী দাওয়ার ওপর কেরোসিনের একটা ডিবরি জ্বালিয়ে রেখে উঠোনের একধারে চুলো ধরিয়ে ভাত চড়িয়ে দেয় মাটির হাঁড়িতে। আবছা, অন্ধকারে মেটে হাঁড়িটা পরিবেষ্টন করে আগুনের শিখা কেঁপে কেঁপে ওঠে। নিরঞ্জন শুয়ে পড়ে গান ধরে।)

(গান)

বড় জ্বালা বিষম জ্বালায়
পুড়ে পুড়ে হব সোনা,
সে কথা তো মিথ্যে হল
হলাম অনুপায়।
দুখের দাহন সুখের আসন
বিজ্ঞজনের হক্ কথা,
শুনে এলাম এই তথ্য।
চলতি পথের একতারায়।
হলাম নিরুপায়।।

[গান শেষে কুঞ্জ রাধিকার প্রবেশ।]

কুঞ্জ। (ক্লান্ত স্বরে) এও য্যানো আবার কার বাড়ি এসে উঠলাম। (দীর্ঘশ্বাস) হায় ভগবান!

রাধিকা। (ক্ষীণ কণ্ঠে) আর ঠাওরই করা যায় না অন্ধকারে।

নিরঞ্জন। (ধড়মড়িয়ে উঠে বসে) কেডা ও।—আরে কথা বলে কেডা ওখানে!

কুঞ্জ। (থতমত খেয়ে) এই—এই আমরা?

নিরঞ্জন। (উঠে দাঁড়ায়) আমরা! আমরা, কেডা তোমরা! বলতে পার!

কুঞ্জ। আমরা—আচ্ছা এখানে প্রধান সমাদ্দারের বাড়ি কোথায়?

নিরঞ্জন। প্রধান সমাদ্দার—(দুই তিন পা এগিয়ে বিস্মিতের ভঙ্গিতে) হ্যাঁ প্রধান সমাদ্দার, কিন্তু তাই কী, কেডা তোমরা!

কুঞ্জ। আমরা! (রাধিকার দিকে তাকিয়ে) নিরঞ্জন, নিরঞ্জনের মতন—

নিরঞ্জন। কথা বলে না। আলোটা নিয়ে আয় দিনি বউ।

[বিনোদিনী কেরোসিনের ডিবরিটা হাতে করে এগিয়ে আসে। লাল আলোতে পরস্পর পরস্পরের মুখের দিকে বিস্মিতের ভঙ্গিতে চেয়ে থাকে এক মুহূর্ত।]

দাদা দাদা তুমি!

[বিনোদিনী রাধিকাকে বাহুবেষ্টনে আঁকড়ে ধরে।]

কুঞ্জ। (ভাঙা গলায়) সেই নিরঞ্জন বউ আমাদের। সেই নিরঞ্জন। (হঠাৎ ত্রস্তে) দেখি দেখি, তো দেখি, তো সেই যে আমি তোরে মেরেছিলাম মাথায় দেখি তো—(নিরঞ্জনের কপালে হাত বুলিয়ে) এখন আর ব্যথা নেই, না!

নিরঞ্জন। (অভিভূত হয়ে) না।

[উভয়ে আলিঙ্গন করে।]

কুঞ্জ। আমাদের নিরঞ্জন বউ।

কুঞ্জ নিরঞ্জনের মাথাটা বুকের মধ্যে টেনে নেয়।

(পটক্ষেপ)

দ্বিতীয় দৃশ্য

কুঞ্জর গৃহপ্রাঙ্গণ। সদ্য কাটা ফসলে ভরে গিয়েছে উঠোনটা। উঠোনের একধারে নিরঞ্জন মাথায় গামছার একটা ফেটা বেঁধে ধোপার পাটের মত উঁচু একটা বাঁশের ফ্রেমের ওপর ধান ঝাড়ছে, আর তার নিচে বহু ধান জমে আছে দেখা যাচ্ছে। রাধিকাকে ধামা ভরতি করে সেই ধান সংগ্রহ করতে দেখা যাচ্ছে। উঠোনের বাঁদিকে একটা নতুন ধানের মরাইয়ের সামনের দিকটা দেখা যাচ্ছে। মাথায় গামছার ফেটা বাঁধা একটা লোক সদ্য কাটা ফসলের বোঝা থেকে আঁটি আঁটি ধান নিরঞ্জনের হাতের কাছে জোগান দিয়ে চলেছে। নিরঞ্জনের পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আর একজন লোক ধান ঝাড়ছে। আর বিনোদিনী কুলো করে ধান উড়োচ্ছে। কুঞ্জ হুঁকো হাতে এদিক ওদিক ঘুরে ঘুরে সব খবরদারি করে বেড়াচ্ছে। উজ্জ্বল দিবালোকে কর্মব্যস্ত মানুষগুলোকে এতদিনে বেশ জীবন্ত মনে হচ্ছে দূর থেকে। অর্ধেক ধামা ধান ভরতি করে রাধিকার দিকে চেয়ে কি একটা রসিকতা করে বিনোদিনী হাসতে হাসতে ধানের ওপর প্রায় লুটোপুটি খাচ্ছে। রাধিকা দু'হাত কুলো ভরতি ধান মাথার ওপর তুলে ধরে হাসছে মুখ টিপে আর ধান ওড়াচ্ছে। নিরঞ্জন কয়েক আঁটি ধান উপর্যুপরি কয়েক বার ফ্রেমের উপর আছড়ে বাঁদিকের খড়ের গাদায় ফেলে দিয়ে হাঁপাতে থাকে। আর হাত দিয়ে কপালের ধান মুছে ফেলে হঠাৎ বিনোদিনীর দিকে নজর করে।

নিরঞ্জন। (হাস্যময়ী বিনোদিনীর প্রতি) দ্যাখো দ্যাখো দ্যাখো দ্যাখো কাণ্ড দ্যাখো! ওমা, দ্যাখো গলে পড়ল! খুব ধান তুলছিস যাহোক! এই রকম কাজ করলেই হয়েছে আর কী!

বিনোদিনীর হাসি আরও বেড়ে যায়। হাসতে হাসতে হুমড়ি খেয়ে পড়ে ধানের ওপর

ওমা, দে-দেখছ কাণ্ড! (কৃত্রিম রোষে) বউদি, তুমি বলছ না কিছু ওরে, আ গেল যা। কথা শুনে হাসতে হাসতে রাধিকার হাত থেকেও যেন কুলো পড়ে যাবার উপক্রম হয় হয়।

ওমা, তোমরা সকলেই তা হলে। কী হয়েছে কী বলদিনি তোমাদের সব?

বিনোদিনী। (হাসি সামলে) হাতির পা দেখিছি। (হাসতে থাকে)

[রাধিকাও হাসে।]

নিরঞ্জন। (কয়েক আঁটি নতুন ফসল নিয়ে) সেই রকমই মনে হচ্ছে বটে।

[ধান ঝাড়তে থাকে।]

রাধিকা। (হাসি থামিয়ে এক কুলো ধান তুলে বিনোদিনীর প্রতি) নে, কাজ কর কাজ কর। বেশি হাসি ভালো না। (হেসে নিরঞ্জনের দিকে ইঙ্গিত করে) যত হাসি তত কান্না বলে গেছে রামসন্না, জানলি!

নিরঞ্জন। (রাধিকার প্রতি) ঐ যে আসছে রামসন্না, দেখাবে'খন হাসি। (রাধিকা কাজে মন দেয়। বিনোদিনী মাথার ঘোমটা একটু টেনে দিয়ে ধান তুলতে থাকে। হাসো, এইবার হাসো!

[ধান তুলতে থাকে।]

কুঞ্জ। (রাধিকার দিকে এগিয়ে) কী, এগারো কাঠার মতো হয়েছে! তো তুলে দাও। (প্রসন্ন হেসে) আমার ধানডাই আগে পড়ুক।

রাধিকা। এগারো কাঠা কেন, দশ কাঠা বল।

নিরঞ্জন। দশ কাঠাই তো। তাই ঠিক হল না মণ্ডলদার বাড়ি বসে।

কুঞ্জ। দশ কাঠা। আচ্ছা তো আর এক কাঠা নয় আমি বেশিই দিলাম নিজের থেকে। এগারো কাঠা দাও। বেরিয়ে গেল যখন একবার মুখ থেকে—

নিরঞ্জন। (প্রসন্ন মুখে) তা সে বোঝো তুমি। মন চায় দ্যাও। ধর্মগোলায়ই তো যাবে, দ্যাও।

[দয়ালের প্রবেশ।]

দয়াল। কী ধর্মগোলায় যাবে?

[রাধিকা ও বিনোদিনী ঘোমটা টেনে দেয়।]

কুঞ্জ। এই যে, মণ্ডল এয়েছে।—না এই ধানের কথা হচ্ছে। বলছি বলি দাও তা হলে আমার ভাগডাই আগে দেই ধর্মগোলায়।

দয়াল। (হেসে টাকে হাতে বুলিয়ে) ভালো ভালো। তা উঠে গেছে তো সব ধান।

কুঞ্জ। হ্যাঁ তা প্রায় গেছে।

দয়াল। যাক্ (রাধিকার প্রতি হেসে) এইবার একদিন নতুন চালের পিঠে খাইয়ে দিও যেন বউমা।

কুঞ্জ। (হেসে) তা সে তো খাওয়াতেই হবে। নবান্ন আসছে।

নিরঞ্জন। আচ্ছা মণ্ডলদা, এবার নবান্ন উৎসব হবে না!

দয়াল। নবান্নের উৎসব, হ্যাঁ, কেন হবে না! নিশ্চয় হবে।

নিরঞ্জন। (হেসে) প্রতি বছর যে রকম হয় এবারও একেবারে সেই রকম ধূমধাম করে। লাঠা-টাঠি খেলা হবে।

দয়াল। হ্যাঁ।—আচ্ছা এবার আমি তোর সঙ্গে লড়ব, তৈরি হয়ে থাকিস।

নিরঞ্জন। (হেসে) আমার সঙ্গে, আচ্ছা! আচ্ছা!

দয়াল। (স্মিত মুখে) হাতলাঠি কিন্তুক।

নিরঞ্জন। আচ্ছা তাই।

দয়াল। হ্যাঁ; আর যদি না পারিস?

নিরঞ্জন। (উৎফুল্লভাবে) না পারি তো এক সের জিলিপি।

দয়াল। (কুঞ্জ ও আর সকলের প্রতি) শুনলে কিন্তু তোমরা সব। এক সের জিলিপি খাওয়াবে নিরঞ্জন আমারে হেরে গেলে পরে। (নিরঞ্জনের প্রতি) আবার দেখিস।

[গমনোদ্যত।]

নিরঞ্জন। (হেসে) হ্যাঁ সে আমি দেখিছি, দেব এক সের তা কী হয়েছে।

[দয়াল গমনোদ্যত।]

কুঞ্জ। মণ্ডলদা চললে নাকি?

দয়াল। হ্যাঁ মাঠের থেকে ঘুরে যাই একবার।... আজ তো বরকতের পালা, নাকি?

কুঞ্জ। হ্যাঁ, আচ্ছা তো এগোও তুমি আমি যাচ্ছি।

[দয়ালের প্রস্থান।]

নিরঞ্জন। (গদগদ হেসে) উ-উ-উঃ, মণ্ডলদা যে সে একেবারে—

রাধিকা। (ঘোমটা খুলে) বুড়ো হলেও মণ্ডলদার তো এখন বেশ শখ আছে দেখি।

বিনোদিনী। (হেসে) মণ্ডলদা কিন্তু বেশ ভালো লাঠি খেলা জানে, হ্যাঁ। কথা তো দিলে, শেষ কালে দশজনের সামনে বুড়োর কাছে আবার অপদস্থ না হও। তা হলে আর—

নিরঞ্জন। ওগো হ্যাঁ, রাখদিনি তুমি! কত মাতব্বর মণ্ডল দেখে এলাম!

রাধিকা। (ঠাট্টার সুরে হেসে) ও এক সের জিলিপি তোমার গেছে যাই বল!

কুঞ্জ। ন্যাও কী হল, হয়নি এগারো কাঠার মতো এখনও! না, হাসবে আর শুদ্ধু মস্করা করবে তার কাজ হবে কী করে!

রাধিকা। (কৃত্রিম রোষে) ওমা, তা তুলবে তো তোলো না ধান ধর্মগোলায়, আমি কি বারণ করছি। আ গেল যা! একেবারে খেয়ে ফেললে কানের মাথা এগারো কাঠা এগারো কাঠা করে।

নিরঞ্জন। তা হয়ে তো গেছে, এইবার তুলে ফ্যালো না।

রাধিকা। ভর লো বিনো ধান কাঠায়।

কুঞ্জ। ধর্মগোলায় ধান দিবি কালো মুখ করে যেন দিসনি বউ। স্মরণ করে দ্যাখ, এই ধান—

রাধিকা। ওমা, কালো মুখ করব ক্যানো। ধর্মগোলায় ধান উঠবে তার আবার—ন্যাও ধরো।

(কূলো নামিয়ে রেখে রাধিকা বিনোদিনীর কাছ থেকে ধামা ভরতি করে ধান নিয়ে কুঞ্জর হাতে দেয় তার কুঞ্জ গোলার বন্ধ পথে ধান চালতে থাকে। নিরঞ্জন যেমন তেমনই ধান ঝাড়তে থাকে। বিনোদিনী আর একটা ধামার ধান ভরতি করতে থাকে।)

কুঞ্জ। (গোলায় ধান ঢালতে ঢালতে) কার ধান—আর কে দেয়! এই জমি বিক্রি করা নিয়েই বা কত, হুঁঃ! সংসার, সংসার—আসবার সময় দেখাড়া পর্যন্ত হল না। কোথায় যে গেল! হয়তো মরেই গেছে য়্যাদ্দিন—যাগ্‌গে আমার কাজ আমি করে যাই।

রাধিকা। (দ্বিতীয় ধামা ভরতি ধান নিয়ে) কই গো ধর।

কুঞ্জ। ও, এই যে, ন্যাও এই—

[খালি ধামাটা কুঞ্জর হাত থেকে রাধিকা বিনোদিনীর হাতে দিল।]

রাধিকা। নে লো।

[গায়ে ঢিলে আলখাল্লা পরা জনৈক ফকিরের প্রবেশ। হাতের সাদা চামর দুলিয়ে গাইতে লাগল।]

পেছনে দুজন ফকিরের দোহার, ধুয়া ধরে চলে—'আপনি বাঁচলে তো বাপের নাম'।

ফকির। (ডাক ছেড়ে বিড় বিড় করে কী সব বলতে লাগল) ও-ো-ো (বিড় বিড় করতে লাগল)

আপনি বাঁচলে তো বাপের নাম মিথ্যা সে বয়ান।
হিন্দু মুসলিম যতেক চাষী দোস্তালি পাতান।।
এ ছাড়া আর উপায় নাই সার বুঝ সবে।
আজও যদি শিক্ষা না হয় শিক্ষা হবে কবে।।
(এখন) বুঝে শুনে যেবা জন পৃথক হয়ে রয়।
ছয় মাসের মধ্যে তার এন্তেকাল ফরমায়।।
খলিলপুরের জব্বর মিঞার দুঃখের কথা জানো।
প্রতিবেশী পতিত পাবন বৈরী যে কারণ।।
কালান্ত আকালে এমন কত চাষী ভাই।
অকালে যে প্রাণ হারাইল লেখা জোখা নাই।।
গরু বাছুর মরল কত হিসাব কে তার রাখে।

নারী শিশু প্রাণ হারাইল কত লাখে লাখে।।
ঘরের বউ বাউরা হইয়া উধাও হইয়া যায়।
এ নহে জঘন্য বৃত্তি জীবনের দায়।।
বালবাচ্চা কচি শিশু দুধ না পাইয়া মরে।
জননী প্রেতিনী হইল বুকে রক্ত ঝরে।।
কোমরে কাপড় নাই বস্ত্র অনটন।
গৃহস্থের হইল দায় লজ্জা নিবারণ।।
কলসকাঠির এরশাদের বউ বললে কেঁদে ডেকে।
কবর খুঁড়ে কাপড় নিয়ে তবে লজ্জা ঢাকে
বাঁচিয়া মরিয়া আছে গৃহস্থ সজ্জন।
ঘরে ঘরে অপমৃত্যু কারণ অনশন।।
মাঠে ঝরে পাকা ধান আর চোখে পানি।
শক্ত করে ধরো হাল হালে পাবে পানি।।
এ জীবনের প্রহসনে কী বা বল ফল।
বাঁচিবারে যদি চাও মনে আনো বল।।
আমন ফসল শুভ-লক্ষণ প্রতি ঘরে ঘরে।
গাঁতায় খাটিয়া তোলো মিলি পরস্পরে।।
ক্ষুদ্র বুদ্ধি স্বার্থ সিদ্ধি গৃহস্থের নয়।
ছোট মুখে বড় কথার এই মর্ম হয়।।

পূর্ণ ধুয়া— আপনি বাঁচলে তো...দোস্তালি পাতান।।

ফকির। মা...গায়েন ফকিরকে মুশকিল হইতে আসান করবেন।

রাধিকা ছোট একটা বেতের সাজিতে ভরে ফকিরের ঝুলিতে ধান ঢেলে দেয়।

(পটক্ষেপ)

তৃতীয় দৃশ্য

মরা গঙ্গার ধারে বিস্তীর্ণ প্রান্তর। সুদূর দিগন্তের পশ্চিমাকাশে অস্তমিত সূর্যের রক্তিমাভা। সূর্য ডোবে ডোবে। গোধুলি আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে গেছে চরাচর। আজ নবান্ন-উৎসব। গ্রামের আবাল বৃদ্ধবনিতা তাই ভিড় করছে এই মরা গাঙের ধারে। স্বাস্থ্যহীন শরীরগুলোতে আজও বিগত আকালের কলঙ্কছাপ সুস্পষ্ট। তবু আজ এই স্বর্ণসন্ধ্যায়, এই মরা গাঙের ধারে চলেছে নবান্নের উৎসব। অফুরন্ত প্রাণস্ফূর্তিতে মেতে উঠেছে সব কৃষান-কৃষানীরা। চতুর্থ অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে যে সমস্ত চরিত্রগুলো সভায় যোগদান করেছিল বিভিন্ন বেশে এই উৎসবে আজ তারা সকলেই সমুপস্থিত। সকলেই গৃহস্থ চাষী। বেশির ভাগ লোকেরই খালি গা, সঙ্গে একখানা গামছা—মাথায়, কোমরে বা কাঁধে।

নেপথ্য থেকে মাঝে মাঝে গরুর ডাক শোনা যাচ্ছে। আর থেকে থেকে গরুর গলার ঘন্টার শব্দ শোনা যাচ্ছে। ঢোলের শব্দ দু'চারবার পাওয়া যাচ্ছে প্রথম দিকেই।

পর্দা সরে যেতেই দেখা যাচ্ছে স্টেজের একদম পেছন দিকে Shadow play দেখবার জন্যে চার ফুট উঁচু একটা প্রাচীরের সামনে চাষী মেয়েরা সব দলে দলে পা ছড়িয়ে ব'সে গান করছে আর পান খাচ্ছে। কপালগুলো তাদের সব তৈলাধিক্যে চকচক করছে। কলহাস্যে মুখর পরিবেশ।

আর সামনে খালি গায়ে চাষীরা লড়ায়ে মোরগ কোলে করে বসে আছে। মোরগদের পায়ে সুতো বাঁধা, মাঝে মাঝে ডানা ঝাপটে শব্দ করে উঠছে। চাষী রমণীদের গান শেষ হতেই মোরগের লড়াই শুরু হল। ভিড় করে দাঁড়াল সব দর্শকরা। জোড়ায় জোড়ায় লড়াই। যে বাজী জিতল তাকে নতুন একখানা গামছা আর একখানা কাস্তে দিয়ে সম্মানিত করা হল।

মোরগের লড়াই শেষ হতেই চাষীদের একটা গান শুরু হল, আর সেই গান ছাপিয়ে নেপথ্যে উঠল ধাবমান গরুর ক্ষুরের শব্দ—গরু-দৌড় হচ্ছে। এই দৃশ্যটি Shadow play করে দেখাতে হবে। পিচবোর্ডের গরু বা বড়ো পুতুলের সাহায্যেও এটা দেখানো যেতে পারে। এই সময় গরুর গলার ঘন্টাগুলো সব একসঙ্গে জোরে ঝম ঝম করে বাজতে থাকবে আর নেপথ্যে হুড় হুড় দুড় দুড় শব্দ হবে। অনুসন্ধান করে যার গরু বাজি জিতবে জানা যাবে তাকে একখানা নতুন কাপড়, একখানা গামছা আর একখানা নতুন লাঙল উপহার দিয়ে সম্মানিত করা হবে।

গরু দৌড় শেষ হতে সঙ্গে সঙ্গেই আরম্ভ হল তুমুল ঢোল আর কাঁসর বাজনা। এইবার লাঠিখেলা। ঢোলের সঙ্গে তাল রেখে বেতের ঢাল আর হাতলাঠি নিয়ে দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ শুরু হল নৃত্যছন্দে। দু-একটা লড়াই হয়ে যাবার পর তৃতীয় রাউণ্ডের জোর একটা লড়াই-এর শুরুতে প্রধান এসে হাজির হল।

[(কৃষকরমণীদের গান)]

নিসলো চেয়ে সামনের হাটে গলার হাঁসুলি
ডুরে শাড়ি পাছাপাড় আর হার সাতনলি।
ক'নে দেখা আলো মেখে আসবে বঁধু আল বেয়ে
দেখে হেসে সরে যাবি কথা না কয়ে।।

চারজন চারজন আটজন লোক ঝুঁটিওয়ালা আটটা মোরগ কোলে করে বসে আছে। প্রত্যেকটি মোরগের পায়ের সঙ্গে সুতো বেঁধে বাঁহাতের তর্জনীর সঙ্গে পেঁচিয়ে বাধা আছে; উড়লেও উড়ে যেতে পারবে না। সকলেই যে যার মোরগের তারিফ করছে মাথায় হাত বুলিয়ে। গান শেষ হতেই কথাবার্তা শুরু হল।

১ম সারির ১ম ব্যক্তি। (মোরগ উড়ে যাবার চেষ্টা করতেই ধরে) আরে র-র-বেটা-র। বাজি জিতবে বলে একেবারে তর সইছে না, য়্যাঁ!

২য় সারির ৪র্থ ব্যক্তি। (মোরগ ডানা ঝাপটাতেই)। বাপুরে, বাপুরে বাপুরে তেজ। মেজাজ চড়ে গেছে বাবুর কথাবার্তা শুনে। দ্যাখো না, একেবারে ডগমগ করছে চোখ! লড়বা, লড়বা, সবুর।

২য় সারির ৩য় ব্যক্তি। (মোরগ কোলে করে) আর অগরারে ধরতেই পারলাম না কিছুতে। এই খপ করে ধরতে যাব কি সঙ্গে সঙ্গে উড়ে গিয়ে বেরুল বাদাড়ে! (মোরগকে লক্ষ করে) সামনে পেলাম, ধরে নিয়ে এলাম এডারেই! এট্টু কমজোরি, তা হলেও কায়দা জানা আছে। প্যাঁচ মারা তো দ্যাখনি এর! হ্যাঁ হ্যাঁ বাবা, অগরা পর্যন্ত কাছে ঘেঁসতে সাহস করে না এর!

২য় সারির ১ম ব্যক্তি। (১ম সারির ২য় ব্যক্তির প্রতি) তা ও বাচ্চাডারে ধরে এনেছ কেন মিঞা? সব ডাঁটো ডাঁটো মোরগ এক বাজির তালও সামলাতে পারবে না ঐ বাচ্চা।

১ম সারির ২য় ব্যক্তি। (একটু মুখ টিপে হেসে হেসে) কোন বাচ্চা!

২য় সারির ১ম ব্যক্তি। তোমার কোলের মোরগের কথা বলছি। বলছি বলি আনলে যখন তখন ভালো দেখে একটা খাসি আনলেই পারতে!

১ম সারির ২য় ব্যক্তি। (একটু উপেক্ষার হাসি হেসে) বলতে পার!

১ম সারির ৩য় ব্যক্তি। (২য় সারির ১ম ব্যক্তির প্রতি) বলি খুব তো লম্বাই চওড়াই বাত বলছ। ও মোরগ কোথাকার জানো?

২য় সারির ১ম ব্যক্তি। (থতমত খেয়ে) কোথাকার!

১ম সারির ২য় ব্যক্তি। (১ম সারির ৩য় ব্যক্তির প্রতি) আরে চুপ করে যাও; কান আছে শুনে যাই।

১ম সারির ৩য় ব্যক্তি। হুঃ চ'রে মোরগ। ওর জাতই ঐ, দেখতে ছোটো। কিন্তু একেবারে বিচ্ছু।

১ম সারির ২য় ব্যক্তি। কত বড়ো বড়ো পালা খাসি বলে তিন ঝাপ্পড়ে লটকে ফেলে ভুঁই-এ! বিষটা তো জানো না এর; তাই বাচ্চা বলছ।

১ম সারির ২য় ব্যক্তি। (১ম সারির ২য় ব্যক্তির মোরগের ঠোঁটে হাত দিয়ে) ঠোঁটটাই দ্যাখো না, শক্ত যেন একেবারে ল্য। ব্যাটা ঠোকরায় তো না যেন ছুরি চালায়।

[হাতের টিপ খেয়ে মোরগটা ডেকে উঠল।]

২য় সারির ১ম ব্যক্তি। (হতাশ হয়ে) আমার পালা খাসি।

১ম সারির ২য় ব্যক্তি। ও দেখেই বুঝিছি, আবার বলবা কী। ভাত খেগো তো!

২য় সারির ১ম ব্যক্তি। হ্যাঁ।

[১ম সারির ২য় ব্যক্তি অশ্রদ্ধার ঘাড় বেঁকিয়ে বসল। দয়ালের প্রবেশ।]

দয়াল। কী বসে আছ যে তোমরা সব মোরগ কোলে করে। এইবার শুরু করে দাও।

১ম সারির ১ম ব্যক্তি। হ্যাঁ তো জজেরা এলেই এবার আরম্ভ হতে পারে লড়াই।

দয়াল। জজেরা, তা এসে গেছে তো সব জজেরা। (হাঁক দেয়) বলি ও কুঞ্জ, আর বরকত মিঞারে সঙ্গে নিয়ে এদিকে এসো। মোরগের লড়াইডা হয়ে যাক। (প্রতিযোগীদের

প্রতি) তো ন্যাও শুরু করে দাও এইবার। (মোরগগুলো দেখে) জবর জবর মোরগ এয়েছে তো দেখে এবার।

(প্রথম ও দ্বিতীয় সারির পিছনে জজেরা ও জনতা ভিড় করে দাঁড়ায়। মাঝখানে জোড়ায় জোড়ায় লড়াই শুরু হয়। দর্শকেরা লড়াইয়ে রত মোরগদের তারিফ করে—বারে বেটা, আহা, াহা, মার প্যাঁচ ঝাপটা মার মার ঝাপটা, বেশ, বেশ ইত্যাদি।

নেপথ্যে ঘুঙুরের বোল সহ মেয়েদের গান আবার শোনা যায়। মিনিট দুই তিনেক সময়ের মধ্যেই মোরগের লড়াই শেষ হয়। দ্বিতীয় সারির চতুর্থ ব্যক্তির মোরগ বাজি জেতে। তখন তাকে সবাই মিলে উঁচু করে তুলে ধরা হয় সর্বজন সমক্ষে!)

কুঞ্জ। (সহাস্য মুখে ঘোষণা করে) ফেকু মিঞা, মোরগের লড়াইয়ে বাজি জেতার জন্যে ফেকু মিঞারে উপহার দেওয়া হল—এই একখানা গামছা আর একখান কাস্তে। ফেকু মিঞা হাসি মুখে দু'হাত পেতে উপহার নিল। সকলে তখন আবার তুমুল হর্ষধ্বনি করে ফেকু মিঞাকে সর্বজন সমক্ষে উঁচু করে ধরল।

ফেকু মিঞা। (সহাস্য মুখে) আরে দ্যাখো কী করে, পড়ে যাব পড়ে যাব।

সকলের গান

(আহা) ফেকু মিঞার মোরগ জিতেছে।
দেমাকে মিঞার দাড়ি ফুলে উঠেছে।
(আহা) ফেকু মিঞার মোরগ জিতেছে।

দুই চার ফেরতা গাওয়ার পর সামনের জনতা পাতলা হয়ে যায়। ত্রস্ত গতিতে সব পেছন দিকে ছুটে চলে। এই সময় নেপথ্যে ধাবমান গরুর ক্ষুরের শব্দ উঠবে আর সঙ্গে সঙ্গে রিনটিন টুং টাং ঝমা ঝম্ ঝম্ ঘন্টার আওয়াজ হতে থাকবে। Shadow play-র সাহায্যে দু'চারটে গোরু বৃহদাকারে দেখানো যেতে পারে একদম পেছনের সাদা পর্দায়। পর্দার গায় ছায়াছবিতে গোটা দুয়েক গোরুর ঊর্ধ্ব পুচ্ছ দেখিয়েও গতিবেগটা বোঝানো যেতে পারে। নেপথ্যে এই সময় চলতে থাকবে অবিরাম দ্রুত হুড় হুড় হুড় হুড় আওয়াজ। হট্টগোলের মাঝখানে দু একবার হাম্বা রবও শোনা যাচ্ছে। কিছুক্ষণ পরে একজন চাষীকে কাঁধে করে জনতা হর্ষধ্বনি করতে করতে ঢুকল।

নেপথ্যে থেকে শোনা যায়, আরে গোরু জিতল কার? মঞ্চের উপর ভিড়ের ভেতর থেকেই উত্তর হল, রহমৎউল্লার। রহমৎউল্লাকে ঘাড়ে করে চাষীরা নাচছে।

কুঞ্জ। (গন্ডগোলের ফাঁকে ফাঁকে জোর গলায় ঘোষণা করে) প্রতি বছর, প্রতি বছর যে রকম গোরু আসে এমন দিনে, এবার তেমন মোটেই আসেনি। কারণ বলদ যা ছিল, প্রায়ই সব মরে গেছে, আর যে-গুলো এখনও টিঁকে আছে ঝড়-ঝাপটার পর, সে-গুলিও খুব কাহিল। প্রথমত গোরু-দৌড় এবার বন্ধই রাখা হবে বলে সাবস্ত্য হইছিল। তারপর অবশ্য

মণ্ডলের কথায়, গোরু দৌড় হবে ঠিক হল। মণ্ডল বলিছিল, গোরুই আমাদের এ উৎসবের প্রাণ সুতরাং কাহিল হোক আর যাই হোক গোরু দৌড় এবারেও হবে। বলদগুলোর শরীরে তাকত নেই, তাই গোরু-দৌড় এবার তেমন জুত্সই হল না। তা সে যা হোক, আসেনি কারও তেমন জুতসই বলদের সংখ্যা এবারে একেবারে কম হয়নি। আর যে দৌড় হল, তাতে করে রহমৎউল্লার গোরু বাজি জিতেছে। তাই উপহার হিসেবে রহমৎ ভাইকে এবার একখানা নতুন কাপড় আর একখানা লাঙল দেওয়া হবে। লাঙলখানা দিয়েছেন আমাদের দয়াল মণ্ডল।

(জনতা রহমৎউল্লাকে তুমুল হর্ষধ্বনি করে আবার একবার সর্বজন সমক্ষে উঁচু করে ধরে নামিয়ে দেয়। রহমৎউল্লাকে পেছন দিক থেকে ঠেলে সামনে এগিয়ে দেওয়া হল। দয়াল মণ্ডল সহাস্য মুখে রহমৎউল্লার হাতে একখানা নতুন কাপড় ও একখানা লাঙল তুলে দেয়।)

দয়াল। আসছে বারে ভালো বলদ আনা চাই।

[রহমৎ গদগদ হয়ে হাসে আর জনতা তুমুল হর্ষধ্বনি করতে থাকে।]

কুঞ্জ। জোরসে হাল চালাবা এবার আর কী!

সঙ্গে সঙ্গে নেপথ্যে শুরু হয় তুমুল ঢোল কাঁসির আওয়াজ। ছন্দ যেন দুলে দুলে উঠছে থেকে থেকে। এবার লাঠিখেলা। বাজিয়েরা মঞ্চের উপর নেচে নেচে প্রদক্ষিণ করতে লাগল। জনতা লাল কৌপিনপরা দুজন লাঠিয়ালকে পরিবেষ্টন করে দাঁড়াল। লাঠিয়ালদের বাঁহাতে বেতের ঢাল, আর ডানহাতে হাতলাঠি (নড়ি)। বাজনার তালে তালে পা ফেলে লাঠি খেলতে লাগল। প্রথম রাউন্ড শেষ হতেই ঢোলের আওয়াজ সাময়িকভাবে তিনবার দুনে বেজে বন্ধ হতে না হতেই দ্বিতীয় রাউন্ডের দুজন লেঠেলের মল্লভূমে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে আবার বেজে উঠল দুনে নৃত্যছন্দে। এবারকার লেঠেলরা খুব কায়দা করে খেলা দেখাল। দ্বিতীয় রাউন্ডের বিরতির পর বৃদ্ধ দুইজন লাঠিয়ালের খেলা শুরু হল। প্রথম দিকে ঢিমে তালে খেলা শুরু হবার একটু পরেই দেখা গেল দূরে ঢোলের ছন্দ পায়ে তুলে প্রধান আসছে নাচতে নাচতে। নেপথ্যে মেঘের গুরু গুরু ধ্বনি।

১ম দর্শক। উত্তরে মেঘ হয়েছে, এট্টু তাড়াতাড়ি নাও।

কেউ শুনল না। বাজনার তালে তালে পুর্ণোদ্যমে শুরু হল লাঠিখেলা। দুলে উঠতে লাগল ঢোলের বাজনা আর কাঁসির শব্দ থেকে থেকে। হঠাৎ লাঠিখেলার মাঝখানে দু চারজন দর্শকের দৃষ্টি গিয়েপড়ল প্রধানের ওপর। মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে তাকাতে লাগল তারা প্রধানের দিকে—যেন কিছুতেই চিনে উঠতে পারছে না লোকটাকে। প্রধান গাঁই-গুঁই শব্দ করতে করতে এগিয়ে আসতে থাকে। হঠাৎ জনৈক দর্শক চেঁচিয়ে ফেটে পড়ে। গুরু গুরু মেঘের ধ্বনি।

২য় দর্শক। (খুব জোরে চেঁচিয়ে ফেটে পড়ে) মোড়ল, মোড়ল এয়েছে! মোড়ল!

(আবর্জনার কাঁড়ি বগলে নিয়ে প্রধান এগিয়ে আসে মাথা নাড়তে নাড়তে আর হাসে।

সকলের দৃষ্টি প্রধানের ওপর গিয়ে নিবদ্ধ হয়। জনতা এক পাশে সরে দাঁড়ায়। ঢোল থেমে যায়।)

প্রধান। আমি এইছি, এসে পড়েছি আমি।

(জনতার মাঝখানে বীর লাঠিয়ালের বেশে লাল কৌপিন পরে দাঁড়িয়ে আছে দয়াল। চোখ মুখ উদ্ভাসিত হয়ে গেছে তার অপূর্ব এক আনন্দে। কিন্তু কথা বলতে পারছে না। কুঞ্জ, নিরঞ্জনও নির্বাক হয়ে গেছে।)

আমি এসে পড়েছি। এসে পড়েছি আমি।

কালো একখানা মেঘ উঠে আসে ধীরে ধীরে উৎসবের মাথার উপর।

দয়াল। (বিশ্বাস যেন হয় না, তাই নিম্ন স্বরে) প্রধান, প্রধান এলে! প্রধান!

কুঞ্জ। (চিৎকার করে ফেটে পড়ে জড়িয়ে ধরে প্রধানকে) জেঠা! জেঠা! জেঠা!

প্রধান। (স্মরণে আসে কি আসে না তাই দ্বিধা) য়্যাঁ, য়্যাঁ, কুঞ্জ আমার কুঞ্জ!

[কুঞ্জর মুখটা দু-হাতে ধরে দেখতে লাগল!]

কুঞ্জ, কুঞ্জ!(গরু গরু মেঘের ধ্বনি)

দয়াল। (এগিয়ে এসে) প্রধান চিনতে পারো এই বুড়োরে য়্যাঁ, চিনতে পারো!

(এক গাল দাড়ি মাথার চুলের জট থেকে মুখের ওপর এসে পড়েছে প্রধানের! সেই বিকৃতদর্শন মুখখানার ওপর যেন হঠাৎ জ্বলে উঠল শাণিত দৃষ্টিটা।)

প্রধান। (তর্জনী তুলে) তুমি, তুমি বাবুরালি—(পাথরের মূর্তির মত চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে দয়াল) য়্যাঁ, য়্যাঁ তুমি, কৃপনাথ।

[দয়াল কোনো সাড়া দেয় না!]

তুমি, তুমি, কেডা তুমি? (কৌতূহলী করুণ হেসে) দয়াল! দয়াল! তুমি দয়াল!

দয়াল। য়্যাঁ, স্মরণে আসে, প্রধান?

প্রধান। (হেসে তর্জনী তুলে) হ্যাঁ, আসে স্মরণে আসে। দয়াল! দয়াল! তুমি দয়াল।

(দু-ফোটা জল গড়িয়ে পড়ে চোখ দিয়ে প্রধানের। গুরু গুরু মেঘের ধ্বনি।)

দয়াল। আজ আমাদের নবান্নের উৎসব প্রধান।

প্রধান। নবান্নের উৎসব! ভালো, ভালো, নবান্ন ভালো। সুদিন পড়েছে সব! দুঃখের দিন সব কেটে গেছে। কেটে গেছে সব দুঃখের দিন। আর আসবে না।

দয়াল। যদি আসেই, তো ডর কিসের!

প্রধান। ডর নেই! দুখেরে ডরাও না; য়্যাঁ, ডরাও না দুখেরে! বেশ, বেশ, বেশ ভলো। ভালো। ভালো।

দয়াল। ডর আছে, কিন্তু প্রধান, মন্বন্তরের দাপটও তো গিয়েছে এই মাথার ওপর দিয়ে, মরিনি তো সবাই আমরা! আমরা তো বেঁচেই আছি। এই যে তোমার কুঞ্জ, নিরঞ্জন, এই যে বরকত, সখীচরণ। চেনে তো সব এদের? কই মরিনি তো আমরা সবাই মন্বন্তরে।

প্রধান। মরনি, মরনি মন্বন্তরে, ভালো। ভালো। ভালো। কিন্তু দয়াল, মন্বন্তর যদি আবার আসে! আবার যদি আসে সেই মন্বন্তর!

(গুরুগুরু মেঘের আওয়াজ। জলভরা কালো মেঘের একটা অংশ উঠে এল উৎসব অঙ্গানের এক চতুর্থাংশের ওপর কালো ছায়া ফেলে।)

(মেঘের দিকে লক্ষ্য করে) এই দ্যাখো নিচে এই উৎসব, কত আহ্লাদ, কত আনন্দ, কিন্তু আবার ঐ ঐখানে, ঐ ওপরে, দ্যাখো কত বড়ো একটা গোলযোগ গুঁড়ি মেরে এগিয়ে আসছে। কত বড়ো একটা গোলযোগ! কত বড়ো একটা—

[বিকৃত মুখে মাথা নাড়তে লাগল।]

দয়াল। জানি প্রধান, মানি তোমার আশঙ্কা। কিন্তু এ কথাও জেনো প্রধান, যে গতবারের মতো এবার আর আকাল আচম্বিতে এসে আমার চোখের ওপর থেকে আমারই পরিজন; আমারই স্বজন, আমারই বন্ধুবান্ধব (জনতার দিকে হাত তুলে দেখিয়ে) এই এরাই তো আমার আত্মীয় পরিজন, ছিনিয়ে নিয়ে যেতে পারবে না এদের। কিছুতেই না। এদের নিতে হলে আগে আমাকে নিতে হবে, আমারে ঘায়েল করতে হবে, এট্টা ব্যবস্থার ওলট-পালট করে ফেলে দিতে হবে প্রধান, তবে, তবে যদি পারে। জোর, জোর প্রতিরোধ প্রধান এবার! জোর প্রতিরোধ! জোর প্রতিরোধ!

প্রধান। (জোরে চীৎকার করে ফেটে পড়ে জড়িয়ে ধরে দয়ালকে) দয়াল!

যবনিকা

৪৭.১৪ সারাংশ ঃ (নবান্ন ঃ চতুর্থ অঙ্ক)

আবার সেই আমিনপুর। কিন্তু এ যেন এক নতুন গ্রাম। হকচকিয়ে যায় তারা। এখানে বাড়ি উঠেছে। তাই কুঞ্জ বলে, এও য্যানো আবার কার বাড়ি এসে উঠলাম।’ রাধিকা ক্লান্ত অবসন্ন ক্ষীণ কণ্ঠে উচ্চারণ করে, ‘আর ঠাওরই করা যায় না অন্ধকারে। তাদের কণ্ঠস্বর শুনে ধড়মড়িয়ে উঠে বসে নিরঞ্জন। তারপর দুই ভাই আর দুই বৌ-এর মিলন হয়—এক বিষাদঘন মমতামেদুর পরিবেশ সৃষ্টি ক’রে।

[৪র্থ অঙ্ক, ১ম দৃশ্য]

অপরদিকে। প্রধান, কুঞ্জ আর রাধিকাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়ে ঘুরতে ঘুরতে এসে ওঠে এক হাসপাতালে। প্রায় উন্মাদগ্রস্ত প্রধানের চোখ দিয়ে হাসপাতালের চিকিৎসা ব্যাপারে নিদারুণ দুরবস্থার পরিচয় পাওয়া যায়। **[৩য় অঙ্ক, ২য় দৃশ্য]** তারপর ওখান থেকে প্রধান ঘুরতে ঘুরতে ফিরে আসে গ্রামে। আমিনপুরে সে যখন ফিরে আসে তখন গোটা আমিনপুরের চালচিত্রটাই গেছে বদলিয়ে। দুর্ভিক্ষ আর হাহাকারের কবল থেকে মুক্তি পেয়েছে আমিনপুর। ফিরে পেয়েছে তার পূর্বেকার স্বাভাবিক জীবনযাত্রা। নবান্নের উৎসবে মুখর হয়ে উঠেছে সমস্ত গ্রামটা। নবান্নের উৎসবমুখর আনন্দঘন দিনে আমিনপুরের হিন্দু-মুসলমান অধিবাসীবৃন্দ তাদের প্রাণের প্রধানকে ফিরে পেয়ে আত্মহারা হয়ে ওঠে। দয়াল জানায়—‘আজ আমাদের নবান্নের উৎসব প্রধান।’ **[৪র্থ অঙ্ক, ৩য় দৃশ্য]** শোষণমুক্ত সমাজের

স্বপ্ন নিয়ে তার আনন্দ, তার উৎসবের আয়োজনে দৃঢ়সংকল্প ঘোষণায় নাটকের পরিসমাপ্তি। 'নবান্ন' নাটকে এটি আর একটি নূতন মাত্রা সংযোজন করেছে। হিন্দু-মুসলমানের মিলনের ইঙ্গিত, এই নাটকের আর একটি বৈশিষ্ট্য। গণচেতনা বৃদ্ধির এই প্রচেষ্টা 'নবান্ন' নাটকের উজ্জ্বলতম দিক। যে মানুষ একসময়ে প্রাণঘাতী দাঙ্গার সামিল হয়ে পারস্পরিক হানাহানিতে লিপ্ত হয়, সেই মানুষেরাই হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে উৎসবের আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠেছে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের প্রতিশ্রুতি রচনা করেছে।

প্রধানও সেই আনন্দে ঝাঁপিয়ে পড়ে। ঘটনার ঘনঘটায় সে মস্তিষ্কের ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছিল। ঘটনার সুস্থিরতায় হৃত ভারসাম্য পুনঃ অর্জিত হয়। স্বাভাবিকভাবে সে নবান্নের উৎসবে যোগ দেয়। 'নবান্নের উৎসব! ভালো, ভালো, নবান্ন ভালো! সুদিন পড়েছে সব! দুঃখের দিন সব কেটে গেছে। কেটে গেছে সব দুঃখের দিন।' কিন্তু তবুও মনের তলায় তির তির করে বয়ে চলে সংশয়ের স্রোত। তাই তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায়, 'আর আসবে না'

প্রধানের আশঙ্কার উত্তর দেয় দয়াল বলিষ্ঠ বিশ্বাসভরা দৃঢ় সংলাপে—'জানি প্রধান মানি তোমার আশঙ্কা। কিন্তু একথাও জেনো প্রধান, যে গতবারর মতো এবার আর আকাল আচম্বিতে এসে, আমার চোখের ওপর থেকে আমারই পরিজন, আমারই স্বজন, আমারই বন্ধুবান্ধব...ছিনিয়ে নিয়ে যেতে পারবে না এদের।...কিছুতেই না। এদের নিতে হলে...এট্টা ব্যবস্থার ওলট পালট করে ফেলে দিতে হবে, তবে যদি পারে। জোর জোর প্রতিরোধ প্রধান এবার। জোর প্রতিরোধ। জোর প্রতিরোধ।

[৪র্থ অঙ্ক, শেষ দৃশ্য]

নবান্নের উৎসব মুখর দিনে দয়ালের প্রত্যয় দৃপ্ত শপথের মধ্যে নাটকের সমাপ্তি ঘটেছে। কাহিনীর সমাপ্তি সংলাপ স্পষ্টভাবে ইঙ্গিত করছে এই নাটক প্রতিরোধের নাটক। সুতরাং এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে এই মন্তব্য খুবই যুক্তিগ্রাহ্য হবে যে গতানুগতিকতা বর্জিত 'নবান্ন' বাংলা নাট্যসাহিত্যে একটি স্বতন্ত্র সংযোজন, একটি অনন্য আস্বাদ, একটি অনাবিষ্কৃত দিগন্তের বার্তাবাহী।

৪৭.১৫ অনুশীলনী ২

১। শূন্যস্থান পূরণ করুন ঃ

(ক) তা ও বেঁচে থাক বাবা........................ , বেঁচে থাক আমার...................... , না হয় .... পয়সা নেবে, জিনিষটি তো ঠিক পাওয়া যাবে।

(খ) থাকবার মধ্যে................. ছিল, গেল। গেল। পথে নেমে দাঁড়াবারও .... সইল নারে কুতুও, ... ঘরে উঠে এল। ঘর বার সব .... হয়ে গেল।

(গ) আপনি বাঁচলে তো .... মিথ্যা সে .... । .... যতেক চাষী .... পাতনি।

২। (ক) "কুঞ্জ ও কুঞ্জ, আমি প্রাণ দেব রে কুঞ্জ। শত্তুরের মুখে ছাই দিয়ে আমি প্রাণ দেব রে কুঞ্জ।" —প্রসঙ্গটি কী? বক্তা কে? কাকে বলেছেন? উক্তিটির তাৎপর্য বুঝিয়ে লিখুন।